প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

(47) H (2)

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Recommended by the Board of Secondary Education, West Bengal, as a Text Book of History for Class VI for 1980 onwards
Vide T. B. No. VI/H/79/139 dated 5. 12. 79.

প্রাচীন
সভ্যতার ইতিহাস

॥ ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ॥

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি.
এফ. আর. এ. এস. (লণ্ডন)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক

ও

অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.
ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সর্দার কলেজের
ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

গোস্বামী প্রকাশনী
৩ কলেজ রো
কলিকাতা—৯

GOSWAMI PRAKASHANI Rs. 6.50

প্রকাশনায় :
শ্রীপ্রণবগোপাল গোস্বামী
গোস্বামী প্রকাশনী
৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

S.C.E.R.T. West Bengal
Date 10 7 89
Acc. No. 4627

সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৯
সর্বস্বত্ব প্রকাশকের সংরক্ষিত

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫/২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

ভূমিকা

"ইতিহাসের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ"—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে কোন্ সংখ্যাতীত অতীতে পৃথিবীতে কিভাবে কখন প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে—এ তত্ত্ব ইতিহাসের নয়। এটা বিজ্ঞানের রহস্য এবং এর প্রায়ই অজানা। তবে কত হাজার হাজার বা লক্ষাধিক বছর ধরে পৃথিবীর আদিম মানুষ ধাপে ধাপে ক্রমবিকাশের পথে নিরন্তর যে এগিয়েছে—এটা অস্বীকার করার নয়। সভ্যতার অভিযানে কত ক্ষয়ক্ষতি, খেসারত, কত ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে, যুগের পর যুগ ধরে তারা পথ করে চলেছে। তারই ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি। সেসব কাহিনীর অতি অল্পই ইতিহাসের গোচরে এসেছে। কবিগুরুর ভাষায়—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
.....
রয়ে গেল অগোচরে।" —রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু পুরোনো দিনের মানুষের সভ্যতার যা আমরা জেনেছি, মাটির স্তরের ভাঙ্গাচোরা স্মৃতিচিহ্নে যেসব খোঁজ পেয়েছি, এবং যা পেয়েছি শত শত পুরাতন জীর্ণ উপাদানের সূত্রে—তাদের মূল্যও কম নয়। বহু মনীষীর ধ্যানজ্ঞান ও তাদের লেখা বইপত্রের ভিত্তিতে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের এই এক ছোট্ট রূপরেখার কল্পনা করেছি। এ কাজে তাঁদের ঋণ অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

পর্ষদ্‌নির্দেশ মেনে অল্প বয়সের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে সরল, স্বচ্ছ ও সহজ ভাষায় গল্পের ঢঙে বিষয়বস্তুর সমাবেশ করেছি। ভাষাশিল্পে সৌষ্ঠব, আকর্ষণীয়তা ও সঙ্গতিক্রম রক্ষা করবার জন্য যথাশক্তি চিন্তা ও শ্রম নিয়োগ করেছি। নানা দেশের মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্যও চেষ্টার অভিব্যক্তি আছে। অতীত স্মৃতিকে জীবন্ত করে বোঝাবার জন্য সেই ভাবরূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে চিত্র ও মানচিত্রের যথাসম্ভব সঙ্গত সুষমা। বইটি অনুমোদন-সূত্রে প্রশংসা পেয়েছে সত্য, কিন্তু এর গুণাগুণ বিচারের শেষ কথা নির্ভর করে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের উপরে। কারণ তাঁদের স্বীকৃতিতেই আমাদের চিন্তা ও শ্রমের সফলতার বিচার।

বিনীত—

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

SYLLABUS FOR HISTORY

CLASS—VI

West Bengal Board of Secondary Education for 1980 onwards

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS

(From Primitive days to the 6th Century A.D. in synoptlic form with special reference to India)

A. (i) Why we should read history; (to be acquainted with human civilisation, its development). (ii) How we come to know of ancient people,

B. **Early man.** Use of fire as early as 300,000 B.C. (by Peking Man'); Food gathering man.

Old Stone Age : Nature of tools and implements, their uses.

New Stone Age : (By 8000 B.C.) Evolution of tools and implements. Man—a food producer.

The Neo-lithic revolution : Consisted also of domeestication of animals : invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling - stone houses with defences ; early transport ; beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

C. **Copper-Bronze Age :** Emergence of towns ; changes in production - specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities), some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisation.

D. **The Early Civilisations** (3000 B.C.-1500 B.C.) - Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China - in outlines :

(i) **Mesopotamia :** (a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas. (b) Fertility of the soil, crops. (c) Defence against floods.

(d) Other occupations. (e) Achievements of Sumerians; imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.

(ii) **Egypt :** (a) Location and nature of the land ; (b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) ; (c) Trade ; (d) The Pyramids (Examples); (e) Religious beliefs ; (f) Chief occupations.

(iii) **The Indus Valley :** (a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ; (b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts : (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv) **China :** (a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ; (b) China in early times ; (c) Myths (particularly of flood).

(v) Common features, in briel of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. **The Iron Age Societies :** (a) Discovery and use of iron, its impact ; (b) Main features of social and economic life ; (c) Growth of Kingship.

I. (i) **Babylon :** Farming and Commerce, Temples and Priests, Learning and cultures ; The code of Hammrabi—nature of society revealed by the Code.

(ii) **Egypt as an Imperial power :** Colonies ; The power of priests.

(iii) **Iran :** Rise of Persia : Zoroaster ;

(iv) **The Jews :** Hebrews in Egypt ; Hebrews exodus under Moses - flight from slavery.

II. **Greece** (only in broad outlines) : An introductory note on the influence of Crete ; The Homeric Age, The city state, cultural interchange, colonisation. Athens and Sparta, their social and political life. Athens Vs. Sparta. Cultural greatness of Athens : Literature, Arts, Religion ; brief reference to a few eminent persons, e.g. Pericles, Sophocles, Socrates, Herodotus. Macedon : Alexander —his invasion of India, Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.

III **Rome** : Origin of Rome, Conflict with Carthage. Early Roman Society ; Particians and Plebeians ; Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus).

Julius Caesar : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. **China** : "Great Shang". Confucius - his teachings, Building the Great Wall. The Chin Empire.

V. **India** : (a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion, and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics, (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires- a btief outiine of developments from the Mauryas - to the Kushans - to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials, viz. inscriptions and literary evidence). (h) Foreign connection and relation with Central Asia—their impact upon society and trade ; (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien—general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature ; education (Taxila and Nalanda) and Sciences (Astronoy, Mathematics, Chemistry, Medicine.)

N.B. The presentation all through should be made in brief outline only, and mostly in story-telling style. The matter should be presented in lucid language and form. The language may be either bookish or spoken, the latter being preferred.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : ইতিহাসের ভূমিকা ... ১—৫

(ক) ইতিহাস কেন পড়ি ? (১—২)

(খ) প্রাচীন মানুষের কথা কিরূপে জানি ? (৩—৫)

দ্বিতীয় অধ্যায় : আদিম যুগের মানুষ ... ৬—১৩

(ক) আগুনের ব্যবহার (৬—৯)

(খ) প্রাচীন প্রস্তর যুগ (৯—১০)

(গ) নতুন প্রস্তর যুগ (১০—১৩)

তৃতীয় অধ্যায় : তামা ও ব্রঞ্জের যুগ ... ১৪—১৭

চতুর্থ অধ্যায় : সভ্যতার প্রথম বিকাশ ... ১৮—৪৮

(ক) মেসোপটেমিয়া (২০—২৫)

(খ) মিশর (ইজিপ্ট) (২৫—৩৫)

(গ) সিন্ধুসভ্যতা (৩৫—৪১)

(ঘ) চীন (৪২—৪৪)

(ঙ) নদী-উপত্যকায় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য (৪৫—৪৮)

পঞ্চম অধ্যায় : লৌহযুগের সমাজ ... ৪৯—১২২

॥ এক ॥ (ক) ব্যাবিলন (৫১—৫৫)

(খ) মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার (৫৬—৫৯)

(গ) ইরান (৬০—৬২)

(ঘ) ইহুদীদের কথা (৬৩—৬৫)।

॥ দুই ॥ গ্রীসদেশের কথা (৬৬—৮১)।

॥ তিন ॥ রোমের কথা (৮২—৯১)

॥ চার ॥ চীন রাজবংশের কথা (৯২—৯৭)

॥ পাঁচ ॥ ভারতবর্ষ

(ক) বৈদিক যুগের সমাজ ও সভ্যতা (৯৮—১০১)

(খ) রামায়ণ ও মহাভারত (১০১—১০৪)

(গ) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম (১০৪—১০৭)

(ঘ) সাম্রাজ্য বিস্তার : মৌর্য সাম্রাজ্য (১০৭—১১১)

(ঙ) কুষাণ সাম্রাজ্য (১১১)

(চ) গুপ্তসাম্রাজ্য (১১২—১১৩)

(ছ) গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষে প্রাচীন বাংলা (১১৩—১১৫)

(জ) বহির্ভারতে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ (১১৫—১১৬)

(ঝ) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ (১১৭—১১৮)

(ঞ) প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি (১১৮—১২২)

সময় সূচী ... ১২৩—১২৬

চিত্র ও মানচিত্রের সূচী ... ১২৭—১২৮

অধ্যায়

১

॥ ইতিহাসের ভূমিকা ॥

(ক) ইতিহাস কেন পড়ি ?

মানুষের বর্তমান সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা নিশ্চয় হঠাৎ গড়ে ওঠে নি। এর পিছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের অতীত জীবনধারার কাহিনী। কোন দূর অতীতে মানুষ পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয়। তখন সে ছিল প্রায় বনমানুষের মত। তার পর থেকে যুগের পর যুগ ধরে চলেছে তাদের জীবনযাত্রার লড়াই। পরে কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বর্তমান সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা তারই পরিণতি। ইতিহাস অতীত যুগের সেই সব জীবনধারার কাহিনীর কথা বলে। 'ইতি-হ-আস'—এটি এমন ছিল, এটি এমন ঘটেছিল—ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থও তাই।

বর্তমানকে জানতে হলে অতীতকে জানতে হবে। ইতিহাসের সাহায্যে আমরা তা জানতে পারি। কোথায়, কখন এবং কি ভাবে ধাপে ধাপে সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছে, ইতিহাস তার পরিচয় দেয়। সে জ্ঞান আমাদের অনেক কাজে লাগে। বর্তমান সমাজের সমস্যা সমাধানে বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের শিক্ষা অনেক সময় সঠিক পথের সন্ধান দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস শোনবার জন্য স্বভাবত আমাদের লোভ আছে। নিজের দেশের সেই সব কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের মানবজাতির পুরানো কাহিনী শোনবার কৌতূহলও কম নয়। দেশ ও কালের ভেদ যাই থাক না কেন, পুরানো দিনের স্মৃতিজড়িত মানুষের জীবন-ধারার ইতিহাস পৃথিবীর মানুষকে আমাদের কাছে অতি আপনার করে তোলে। ইতিহাস পাঠের এও একটা বড় লাভ।

পুরানো কালে ইতিহাস লেখা হত প্রায়ই রাজারাজড়াদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে। ইতিহাস লেখার এ রীতি ঠিক নয়। যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও ইতিহাস হয়। সভ্যতার অভিযানে নানা যুগের নানা জাতির অগণিত মানুষের অবদান আছে। সে হিসেবে সভ্যতার ইতিহাসে সাধারণ মানুষেরও স্থান আছে।

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল খুব অদ্ভুত ভাবে। কেউ কেউ বলেন সূর্য থেকে খানিকটা অংশ কোন সময়ে ঠিকরে পড়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়। প্রথমে সেটা ছিল আগুনের বাষ্পপিণ্ড। তারপর লক্ষ লক্ষ বছর পরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে ঠাণ্ডা নামে। তারও কত হাজার হাজার বছর পরে প্রথমে জল, তারপর জীবকোষ, গাছপালা ও জীবজন্তু জন্ম নেয়। এই ভাবে প্রথম যে মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয়, সে তখন ছিল এক প্রকার বানরের পর্যায়ে। সেই আধা-মানুষ থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে আসল মানুষের আবির্ভাব ঘটে। তাদের আবার হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় ধীরে ধীরে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে। ইতিহাস পড়ে আমরা সেই সব কথা জানতে পারি।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। ইতিহাস আমরা কেন পড়ি ?

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ইতিহাস বলতে কি বোঝায় ?

২। মানুষের সভ্যতা কবে কি ভাবে গড়ে উঠেছে ?

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। কি জানবার জন্য আমাদের আগ্রহ আছে ?

২। পৃথিবীতে জীবজন্তুর কবে আবির্ভাব হয় ?

[ঘ] বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। কথাগুলি ঠিক হলে তার পাশে টিক (√) চিহ্ন, আর ভুল হলে কাটা (×) চিহ্ন দাও :—(ক) পৃথিবী সৃষ্টির পর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা নামে। (খ) প্রথমে মানুষ ছিল বানরের পর্যায়ে। (গ) ইতিহাস বর্তমান জীবনধারার কাহিনী।

———

(খ) প্রাচীন মানুষের কথা কিরূপে জানি ?

পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। সেই আদিম যুগে মানুষ ছিল পশুর সামিল। বাড়িঘর পোশাক-আশাক কিছুই ছিল না। লেখাপড়ার নামগন্ধও ছিল না। লিপির ব্যবহার হয় বহু বহু কাল পরে। কাগজ বা ছাপাখানার কথা তো কেউ ভাবতেই পারত না। কাজেই সে কালের মানুষের কথা কিরূপে জানি—এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে।

এর উত্তর অবশ্যই আছে। তোমাদের বাড়িতে হয়তো পুরানো দিনের কিছু আসবাবপত্র আছে। তা দেখে তোমরা বুঝতে পার সেগুলি তখন কেমন ছিল, এখনকার জিনিসের সঙ্গে তাদের তফাত কি। সেই আসবাবপত্র কি কাজে লাগত, লোকের শখই বা তখন কেমন ছিল,—এসব কথা তোমরা বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে আলাপ করে বুঝে নিতে পার। এই ভাবে প্রাচীন কালের মানুষের ব্যবহারের জিনিসপত্র, বাসন-কোসন, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, ঘরবাড়ি বা আসবাবপত্রের নানা চিহ্ন বা নমুনা দেখতে পেলে সেকালের সভ্যতার খানিকটা অনুমান করা যায়। তাই নানা দেশের পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা মাটি খুঁড়ে পুরানো যুগের বিভিন্ন নিদর্শন খুঁজেছেন। তাঁরা খুঁজেও পেয়েছেন অনেক কিছু। সে সব অনেক জিনিস যাদুঘরে রাখা আছে। সেগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁরা প্রাচীন সভ্যতার নানা স্তরের কথা বলেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার দাপটে, বন্যা, ঝড়তুফান, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উৎপাতে কত গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষ যে মাটির তলায় চাপা পড়েছে—তার হিসেব-নিকেশ নেই। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কত কষ্টে গড়ে-তোলা সভ্যতার কীর্তিচিহ্ন ধ্বংসস্তূপে তলিয়ে গিয়েছে।

জীবাশ্ম, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য নিদর্শন—আজকের দিনে পুরাতাত্ত্বিক খননকাজের ফলে প্রাচীন জীবাশ্ম অনেক পাওয়া গিয়াছে। জীবজন্তুর হাড়, মানুষের কঙ্কাল ও মাথার খুলি—এইগুলিকে বলে জীবাশ্ম। সেগুলির গঠন বিচার করে প্রাচীন কালের নানা যুগের

মানুষের আকার ও স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা মত দিয়েছেন। মানুষের হাড়ের সঙ্গে কোথাও কোথাও পাথরের মোটা বা মসৃণ অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। মোটা অস্ত্রশস্ত্র প্রাচীন প্রস্তর যুগের, আর মসৃণ অস্ত্রশস্ত্র নতুন প্রস্তর যুগের। তামা ও ব্রঞ্জের উপকরণ ও অলংকারের নমুনা থেকে প্রস্তর-পরবর্তী তামা ও ব্রঞ্জ যুগের কাল স্থির করা হয়েছে। পুরাতাত্ত্বিকরা নানা দেশে মাটি খুঁড়ে কত কি আবিষ্কার করেছেন—ভাঙ্গা ঘরবাড়ী, মঠমন্দির, বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, গুহাচিত্র, সমাধি, দেবদেবীর মূর্তি, এমন কত কি। এইসব আবিষ্কার প্রাচীন যুগের কীর্তিকাহিনী ও ধ্যানধারণার বিচিত্র পরিচয় দেয়।

অবশ্য মাটি খুঁড়ে পাওয়া নিদর্শন দেখে সব কথা বলা যায় না। জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে কিছুটা কল্পনা করেও নিতে হয়। সে হল পুরাতাত্ত্বিকদের কাজ। তাঁরাই প্রাচীন ইতিহাসের মালমসলা জুগিয়েছেন। তা থেকেই আমরা প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানতে পারি।

শিলালিপি ও মুদ্রা—শিলালিপি ও মুদ্রা প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। সেকালে রাজারা বীরত্বের কাহিনী, স্মরণীয় ঘটনা বা উপদেশ পাথরের ফলকে খোদাই করে রাখতেন। হাতের লেখা বদলানো যায়, কিন্তু পাথরের লেখা অক্ষয়। লোকে কথায় বলে 'পাথুরে প্রমাণ'। সীলমোহর বা মুদ্রার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। তখনকার রাজাদের চেহারার ছাপ, সন, তারিখ বা বিশেষ ঘটনার কথা মুদ্রার উপরে লেখা থাকত।

সাহিত্য, শিল্প-নিদর্শন ও পর্যটকদের লেখা বিবরণ—দেশের পুরানো সাহিত্যও ইতিহাসের উপাদান। আমাদের দেশের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। অন্যান্য দেশের ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য—যেমন ইরানের জেন্দ্-আবেস্তা, ইহুদীদের বাইবেল—ওল্ড টেস্টামেণ্ট, গ্রীককবি হোমারের

ইলিয়াড ও ওডেসি কাব্য প্রভৃতি—এদেরও সেই সব দেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চিত্র ও স্থাপত্যশিল্পের নমুনা থেকে আমরা সংস্কৃতি ও রুচিবোধের কথা জানতে পারি। গাছের ছালে, ভূর্জপত্রে বা তালপাতায় লেখা প্রাচীন পুঁথিপত্র—এগুলিও ইতিহাসের বিশেষ উপাদান। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণও প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্যের পরিচয় দেয়।

সুদূর অতীতের সব কথা আমরা জানতে পারি নি সত্য। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানের ফলে আগের চাইতে অনেক বেশী খবর আমরা পেয়েছি। পরে আরও অনেক কথা হয়তো জানতে পারব।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। প্রাচীন লোকদের সম্বন্ধে আমরা কি ভাবে জানি ?

২। পুরাতাত্ত্বিকরা কি উপায়ে ইতিহাসের সন্ধান করেন ?

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। জীবাশ্ম কাকে বলে ? তা থেকে কি জানা যায় ?

২। শিলালিপি ও মুদ্রার ঐতিহাসিক মূল্য কি ?

৩। সেকালে কিসের উপরে লেখা হত ?

৪। পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারে কি জানা যায় ?

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। পাথরের অস্ত্রশস্ত্রে কি বোঝা যায় ?

২। সেকালের মুদ্রায় কি লেখা থাকত ?

[ঘ] বস্তুধর্মী প্রশ্ন :

১। শূন্য স্থান পূর্ণ কর :—

(ক) প্রাচীনকালের—থেকে সভ্যতার অনুমান করা যায়।

(খ) আমাদের দেশের পুরানো সাহিত্য—

(গ) শিলালিপি—বহুমূল্য উপাদান।

(ঘ) নূতন প্রস্তরযুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র—। কিন্তু প্রাচীন প্রস্তরযুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র—।

———

অধ্যায়

২

॥ আদিম যুগের মানুষ ॥

(ক) আগুনের ব্যবহার

সভ্যতার সূচনা—গোড়ার দিকে পৃথিবী ছিল জীবজগতের বাসের অযোগ্য। পৃথিবী ছিল প্রথমে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। কালে তাপ ঠাণ্ডা হলে মাটি জল আর বাতাসের সৃষ্টি হয়। তার বহুকাল পরে ধীরে ধীরে জীবকোষ, উদ্ভিদ, আর কতকগুলো প্রাণী জন্মে। এ সব হতে কত যে লক্ষ লক্ষ বছর কেটেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ প্রথমে আধাবানর পর্যায়ে ছিল, বনে জঙ্গলে গাছেই বেশি বাস করত। না ছিল ঘরবাড়ি, না ছিল পোশাক-আশাক। বনের ফলমূল, কচিপাতা, শামুক, গুগলি ছিল খাদ্য। গাছের ডাল ছিল হাতিয়ার। এর আগে তুষারঝড়ে গাছপালা কমে যায়, অনেক বড় বড় প্রাণীও মারা যায়। এমন অদ্ভুত বড় জীবজন্তুর হাড় মাটির নীচে পাওয়া গিয়েছে, যাদের আজ অস্তিত্ব নেই। দারুণ শীতের দাপট এড়াতে মানুষ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু খাবার সন্ধানে তাদেরকে মাঝে মাঝে বের হতে হয়েছিল। এমনি করে শুরু হল তাদের জীবনযাত্রার অভিযান। জীবজগতের লড়াইপর্বের ঘটনা থেকে এও জানা যায় যে উঁচুস্তরের প্রাণী নীচুস্তরের প্রাণীকে পিছনে ফেলে চলে। ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের দেহের গড়নে ও মগজের বুদ্ধিতে অপূর্ব সম্ভাবনা ঘটে। ফলে মানুষ ক্রমশ হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় সেটা হয়।

আদি মানবজাতির জীবনধারার রহস্য আজকের মানুষ খুব অল্পই জানতে পেরেছে। বানর থেকে মানুষ—এই ক্রমবিবর্তনের মাঝখানের যোগসূত্র কি—এ নিয়ে প্রাচীন মানুষের হাড় ও মাথার খুলির কত না পরীক্ষা চলেছে। তবে এটা ঠিক যে মানুষ প্রথমে আধামানুষের মত ছিল। অল্প আয়াসে যা তারা জোগাড় করত,

ফলমূল, গাছের কচিপাতা, তাই তারা খেত। এবড়োথরড়ো পাথর ও গাছের ডাল ছিল হাতিয়ার। এ ধরনের মানুষের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে পূর্ব এশিয়ায় জাভা দ্বীপে। এদের বলা হয় জাভা **মানুষ**। এরা সম্ভবত পৃথিবীর আদি মানুষ। এরা প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত। আসল বানর থেকে এদের তফাত এই যে এদের হাত খাট, পা লম্বা। এরা দুপায়ে ভর দিয়ে চলতে পারত, ফলে দু হাত হয় এদের বড় হাতিয়ার। মাথার গড়নও বড়। ক্রমশ দুটি হাতের ব্যবহার, মগজের বুদ্ধি ও মনের শক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে সভ্যতার দোরগোড়ায় নিয়ে যায়।

জাভা মানুষ

জার্মানীর **হাইডেলবার্গ মানুষ** সম্ভবত প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ। তারা তখন পাহাড়পর্বতের গুহায় বাস করত। হাতের দশ আঙ্গুল তাদের বশে। পাথরের মোটা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পশু শিকার করত। কাঁচা মাংসই খেত। পশুর ছাল গায়ে পরে শীতের হাত থেকে বাঁচত। তানজেনিয়া, আলজেরিয়া, মরোক্কো—এই সব স্থানেও মানুষের বিশেষ বিশেষ ধরনের মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে। তবে চীনের পিকিঙের কাছে আবিষ্কৃত পিকিঙ মানুষেরই খ্যাতি বেশি।

পিকিঙ মানুষ—চীন দেশের পিকিঙের কাছাকাছি চাউ-কাউ-তিয়েন শহরের 'ড্রাগনবোন' পাহাড়ের গুহায় পুরানো কালে একদল মানুষ বাস করত। সেখানকার মানুষের পুরো মাথার খুলি, দাঁত ও দেহের হাড় দেখে বলা হয় যে বানরগোষ্ঠীর জাভামানুষ থেকে এরা উন্নত মানুষ। পিকিঙ মানুষের দাঁত ও চোয়াল ছোট, মাথার গড়ন কিছু বড়। দেহের উচ্চতা সমকালীন মানুষের কাছাকাছি। এই মানুষেরা আগুনের ব্যবহার জানত ও পাথর দিয়ে সরু হাতিয়ার তৈরি

করত। পিকিঙ মানুষের হাড়ের সঙ্গে সরু পুঁতির মালা ও সরু পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়েছে।

আগুনের আবিষ্কার—মানুষের জগতে আগুন আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। সভ্যতার ক্ষেত্রে এর মূল্য খুবই বেশি। এক কালে মানুষ আগুন তৈরি করতে জানত না। কিন্তু বনের আগুন তারা দেখেছে। আগুনের উত্তাপে শীত কমে, জন্তু-জানোয়ার ভয় পায়—তাও তারা জেনেছে। কিন্তু কি করে তারা আগুন তৈরি করবে? কৌশল তো জানা নেই। হয়তো একদিন দুই পাথর ঠোকাঠুকি বা শুকনো দুই কাঠ ঘষাঘষির ফলে আগুন জ্বলে ওঠে। তখন তাদের কি আনন্দ! সেই থেকে শীতের হাত থেকে তারা বাঁচল। হিংস্র জন্তুর ভয়ও তাদের কমল। আগুন তারা অনেক সময় জ্বালিয়েই রেখে দিত। এবারে তারা মাংস বা অন্যান্য খাবার আগুনে পুড়িয়ে খেতে লাগল। কেউ কেউ বলেন, আগুনের ব্যবহার শুরু হয় তিন লক্ষ বছর আগে।

আদিম যুগে আগুনের ব্যবহার

প্রাচীন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক হল জার্মানীর এবং মধ্য এশিয়ার **নিয়েণ্ডার্থাল** মানুষ ও ফরাসীর **ক্রোমানিয়োঁ** মানুষ। ক্রোমানিয়োঁ মানুষ রান্নার কাজ ও নানা ধরনের শিল্পকাজও জানত। গুহার মানুষরা সেকালে ছবিও আঁকত। পশুশিকার ছিল তাদের বড় কাজ। তাই মনের খেয়ালে তারা গুহার গায়ে আঁকত পশুর ছবি।

সেকালের মানুষরা কিন্তু একস্থানে বেশিদিন থাকত না। সম্ভবত জলবায়ু বদল হওয়ায়, খাদ্যের সন্ধানে বা জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে পাহাড়ের গুহা থেকে তারা নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফল ভালই হয়েছে। পরিবর্তনশীল স্বভাবের জন্যই মানুষের এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধির সঙ্গে তাদের শ্রমশক্তির যোগ ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

এংগেল্‌সের মতে বানরপর্যায়ের মানুষ থেকে সভ্য মানুষের অবস্থা পর্যন্ত যে পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে শ্রমের মূল্য কম নয়।

(খ) প্রাচীন প্রস্তর যুগ

পুরাতন প্রস্তর যুগের শুরু কবে থেকে সে বিষয়ে সঠিক সময় জানা যায়নি। অনেকের মতে প্রায় তিরিশ হাজার বছর আগে থেকে প্রাচীন প্রস্তর যুগের আরম্ভ। সেই সময়ে মানুষ প্রায়ই গুহায় বাস করত। তারা পশুশিকার করত। পাথরের ডেলা দিয়ে উপকরণ বানাত।

হাতুড়ি

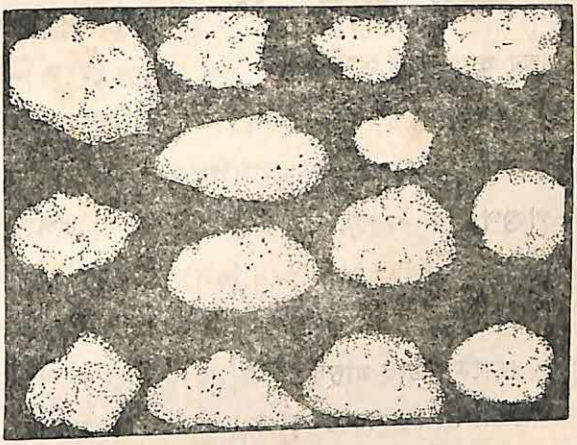

প্রাচীন প্রস্তর যুগের উপকরণ

তারা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শেখে। কিন্তু ভাল অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কৌশল তারা তখন জানত না। কোন রকমে পাথর ঘষে মোটা হাতুড়ি বা কুড়ুলের মত জিনিস বানাতো। কখন কখন গাছের ডাল দিয়ে বাঁট তৈরি করত। এই সব অস্ত্রশস্ত্র তেমন ধারালো ছিল না। তবে তা দিয়েই তারা শিকারের কাজ চালাত। শিকার ও আত্মরক্ষার কাজে তারা সেগুলি ব্যবহার করত। শিকার করা পশুর চামড়ায় তারা গা ঢাকত। তাতে শীতের হাত থেকে তারা বাঁচত। তারা তখন বাড়িঘর করতে শেখেনি।

(গ) নতুন প্রস্তর যুগ

পুরাতন প্রস্তরযুগ অনেক কাল ধরে চলে। তার পরে আসে নতুন প্রস্তর যুগ। এই যুগের শুরু হয় প্রায় আট নয় হাজার বছর আগে। মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসে এ যুগে বেশ একটা পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে তাদের ছিল পাথরের মোটা ধরনের ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র। এবার তৈরি হল বেশ ধারাল, সরু ও চকচকে অস্ত্রশস্ত্র ও নানা সাজসরঞ্জাম।

নতুন প্রস্তর যুগের চারটি পাথর

এতেই প্রথম কারুশিল্পের শুরু হল। কারণ তখনকার অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে সে যুগের মানুষ পাথরগুলোকে অনেক ঘষে মেজে নিত। তারা চুনা পাথর ব্যবহার করেও সরু ও মসৃণ অস্ত্র তৈরি করত। সেই ধারাল অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে গাছের ডালপালাও তারা কাটত।

পশুপালন—মানুষ ক্রমশ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। আগে ফলমূল সে কুড়িয়ে বেড়াত। সে ছিল পশুশিকারী। কিন্তু ক্রমে সে হল পশুপালক। কারণ সব সময় শিকার পাওয়া যায় না। পশুরাও বেগে ছোটে। তাই মানুষ কোন কোন বনের পশুকে ধরে পোষ মানাতে লাগল। গরু ভেড়া মোষ—এই সব পশুকে সহজেই পোষ মানিয়ে নিতে পারল। ইচ্ছে মত গরুভেড়ার দুধ বা তাদের মাংসও খেতে পারত। কোন কোন পশু তাদের ভার বহার কাজ করত। কুকুর আগেই এসে জুটেছে শিকারের সাথী হিসেবে।

খাদ্যসংগ্রহ, কৃষিকাজ, ও বসতি তৈরি—পশুপালনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চাষ-আবাদের কাজ শুরু হয়। ঘুরে ঘুরে গাছের ফলমূল জোগাড় করতে গিয়ে মানুষ বুঝতে পারল যে ভিজে বা নরম মাটিতে বীজ থেকে গাছ জন্মায়। তখন মাটি খুঁড়ে বীজ বুনে ফসল ফলানোর কাজে মন দিল। খাবারের জন্য জল চাই। সঙ্গের পশুদেরও ঘাস-জল চাই। নদীর পাড়েই এই সব সুবিধা। তাই সেখানেই চাষ-আবাদ শুরু হল। তখন লোকে ঘুরে না বেড়িয়ে চাষের জন্য এক জায়গায়

বসবাস আরম্ভ করল। একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়! তাই মিলেমিশে পরস্পর যে যার কাজকাম করতে লাগল। এই ভাবে ক্রমশ গোষ্ঠীজীবন গড়ে উঠল। নদী-উপত্যকায় গ্রাম সৃষ্টি হল। সেখানে ঘর তৈরির জন্য পাথর, কাঠ ও অন্যান্য উপাদানও পাওয়া গেল। গাছপালা, মাটি ও পাথর দিয়ে তারা মজবুত ঘর তৈরি করল। তারা জলের মধ্যেও মাচা বেঁধে তার ওপর ঘর তৈরি করত। তাতে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সুবিধে হত। স্বাস্থ্যের পক্ষেও সেটা ছিল উপকারী। আগে লোকে মাথায় করে ভার বইত। পরে পশুর পিঠে ভার তুলে দিল। তখন কাঠের চাকা তৈরি হল, আর তাই দিয়ে গাড়ী বানান হল। তাতে মালপত্র নেওয়ার কত সুবিধে হল। গাছের গুড়ি ফাঁপা করে নৌকোও তারা তৈরি করল।

পোশাক-আশাক ও বাসনপত্র—আগে মানুষ শিকার করা পশুর চামড়া পরত। পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই ভেড়ার লোম তারা পেতে লাগলো। তখন তাই দিয়ে গরম পোশাক তৈরি করল। পরে তারা গাছের বা পাটের ছালও পরত। ক্রমে পশম ও শন দিয়ে কাপড়চোপড় বা পোশাক-পরিচ্ছদ তারা বানাতে আরম্ভ করে।

আগে কাদামাটি দিয়ে বাসনপত্র তৈরি করত। এবার আগুনে পোড়া মাটির বাসন তৈরি করতে লাগল। মাটির চাকও তৈরি হল। তা দিয়ে গড়া হল নানারকম হাঁড়িকুড়ি ও জিনিসপত্র রাখবার পাত্র।

ভাষা ও লিপি—নতুন প্রস্তর যুগে কৃষিকাজের ফলে খাবারের সংস্থানে কিছুটা নিশ্চয়তা দেখা দিল। তখন মানুষ মনের শক্তি প্রকাশের দিকে বা অন্য স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিল। মানুষের বাক্‌শক্তির সম্ভাবনা গোড়া থেকেই ছিল। আকারে ইঙ্গিতে ও সেই সঙ্গে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে তারা মনের কথা জানাত। এবার তারা ভাষা ব্যবহার আরম্ভ করল। এক এক অঞ্চলের লোকদের মধ্যে একই ধরনে কথাবার্তা চলতে লাগল। আবার মনের ভাবকে ধরে রাখবার জন্য তারা ক্রমে লিপির ব্যবহার আবিষ্কার করল। এইভাবে সেকালে নানা ধরনের অক্ষরমালা গড়ে ওঠে।

শিল্পবোধের চিহ্ন—ছবি এঁকেও তারা মনের ভাব ফুটিয়ে তুলত। তাতে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় প্রকাশ পেত। শিকার করা পশুর কথা ভাবতে গিয়ে পর্বতগুহায় তাদের ছবি এঁকেছে। স্পেনের আলতামিরা গুহার রঙিন ছবি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বাইসনের

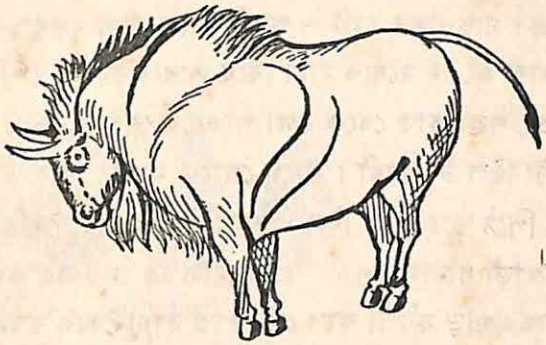

আলতামিরা গুহার বাইসনের ছবি

সে ছবি কত জীবন্ত! মানুষ প্রথমে সম্ভবত বাচ্চা ছেলেদের মত এলোমেলো দাগ টেনে ছবি আঁকত। ক্রমে জন্তু-জানোয়ারের কত ভাল ছবি তারা এঁকেছে। গুহায় সে সব দেখা যায়। লাল কালো হলুদ—কত রঙ তারা ব্যবহার করত। সেকালের মানুষ পুঁতির মত গোল পাথরের গহনা ওঝিনুক পরত। কখনও বা গায়ে রং-বেরঙের ছবি এঁকে শোভা বাড়াত। মাটির পাত্রে নানা ধরনের নকশা, এমন কি হাড়ের উপরও কারুকাজ করত। নরম পাথরের উপর স্থাপত্য শিল্পের কাজও করত। এই ভাবে সেই প্রাচীন যুগে কত রকম শিল্পের আরম্ভ হয়। মানুষের রুচিবোধও ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

নকশা করা মাটির হাঁড়ি

ধর্মবিশ্বাস—সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাসও জাগে। মানুষ দেখে যে সূর্যের তাপ, আলো ও নদীর জল—এসব না হলে জমি চাষ হয় না। গাছপালা, আগুন, জন্তুজানোয়ার, ঝড়, জল, নদী—এসবের শক্তিও কম নয়। তারা ভাবে এরা বুঝি যা খুশি তাই করতে পারে। নিজেদের ক্ষমতা যে কত অল্প, এ কথাও মানুষ ভাবতে শেখে। তারা তখন সেই সব শক্তিকে পূজো করতে থাকে। ফসল ফললে তারা মনে করত যে প্রাকৃতিক শক্তির দয়াতেই সেটা হচ্ছে। তাই ফসল পাওয়ার আগে বা পরে তারা ফসল উৎপাদনের দেবতার উদ্দেশ্যে পূজো দিত। পশু বা নরবলিও দিত। জীবজন্তু, গাছপালা ও প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে নানা দেবদেবীর পূজার প্রচলন হয়। এই ভাবে ধর্মবিশ্বাসের সূচনা হয়।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। আদিযুগের মানবগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২। প্রাচীন প্রস্তর যুগের অবস্থা কিরূপ ছিল ?
৩। নতুন প্রস্তর যুগে মানুষের জগতে কি কি উন্নতি হয় ?
৪। নূতন প্রস্তরযুগে কিভাবে ভাষা, লিপি ও শিল্পের শুরু হয় ?

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। আগুনের ব্যবহার কিভাবে হয় ? এর ফল কি ?
২। পিকিঙ মানুষ বলতে কি বোঝ ?
৩। নতুন প্রস্তরযুগে মানুষ কোথায় ও কি ভাবে বসবাস করত ?
৪। নতুন প্রস্তরযুগে ধর্মবিশ্বাস কিভাবে গড়ে ওঠে ?

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। পশুপালন করতে মানুষ কখন শেখে ?
২। কৃষির কাজ কখন আরম্ভ হয় ?
৩। কিসের ফলে গ্রাম গড়ে ওঠে ?
৫। নতুন প্রস্তরযুগের শিল্পবোধের দুই-একটি দৃষ্টান্ত বল।

[ঘ] বস্তুমূখী প্রশ্ন :

কোন্ কোন্‌টা ঠিক বা ভুল উত্তর বল :—(ক) নতুন প্রস্তর যুগের আরম্ভ হয় ত্রিশ হাজার বছর আগে। (খ) প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয় নদীর তীরে। (গ) পিকিঙ মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না। (ঘ) প্রাচীন প্রস্তর যুগে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ছিল মোটা ধরনের।

অধ্যায়

৩

॥ তামা-ও-ব্রঞ্জের যুগ ॥

নতুন প্রস্তর যুগের কথা তোমরা জেনেছ। এবার তামা-ও-ব্রঞ্জ যুগের কথা জানতে পাবে। আগুনে পাথর গলাতে গিয়ে মানুষ দেখল তা থেকে ধাতু বেরিয়ে আসছে। এই ভাবে প্রথমে আবিষ্কৃত হয় তামা। ব্রঞ্জ তৈরি হয় তামা ও টিন মিশিয়ে। এই সব ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র বেশ সরু ও টেকসই হত। তামা বা ব্রঞ্জের তৈরি ঢাল, বর্শা, তীর, ছুরি ও সেই সব ধাতুর তৈরি নানা অলংকার উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র হিসেবে ব্রঞ্জের গড়া জিনিসগুলি খুবই কাজে লাগত। সম্ভবত ছয় সাত হাজার বছর আগে এই ধাতুযুগের শুরু। আগুনের সাহায্যে ধাতু গলিয়ে মানুষ এই সব ধাতুর বহু রকমের অস্ত্রশস্ত্র, নানা সরঞ্জাম ও অলংকার তৈরি করত। ক্রমে সোনা-রূপোরও আবিষ্কার হয়। এই ভাবে সভ্যতার পথে মানুষ আরও এগিয়ে যায়।

নগর-সভ্যতার পত্তন—পশুপালন ও কৃষিকাজ মানুষ আগেই শিখেছিল। কাঠ, মাটি ও পাথর দিয়ে বাড়িও তৈরি করতে শেখে। মাটির তৈরি ইট সূর্যতাপে শুকানো হত। তাই দিয়ে পাকা বাড়ি হতে থাকে। ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈরির দক্ষতা দেখা যায়। নতুন নতুন বৃত্তি ও নানা কারিগরি কাজের আরম্ভ হয়। শিল্পেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটে। নানা ধরনের পেশায় লোক নিযুক্ত হতে থাকে। কেউ মাঠে কাজ করত, কেউ কাপড় বানাত, কেউ তামার সুতোয় তা বুনত। কেউ বা নদীতে মাছ ধরত। কিন্তু নিজ নিজ প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিনিময় বা আদানপ্রদানের ব্যবস্থা শুরু হয়। ফলে চাষী ফসল দিয়ে মাছ নিত, জেলে মাছ দিয়ে ফসল নিত। এই ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার

দেখা দেয়। তাতে অবস্থার উন্নতি হল। বাড়ি-ঘর-দোর মজবুত করার জন্য ভাল পাকাবাড়ি গড়ার ব্যবস্থা হল। ব্যবসা-বাণিজ্য করে যারা ধনী হত, তারা নগরজীবন গড়ে তোলে। অনেকে শহরেই ব্যবসা-বাণিজ্য করত। আর একদল নানাস্থানে জিনিসপত্র কেনা-বেচা করত। আবার একদল মানুষ গ্রামে বাস করে চাষ-আবাদ বা পশুপালন নিয়েই থাকত। প্রথমে বিনিময়-প্রথায় ব্যবসা চালু হয়, পরে মুদ্রার প্রচলন হয়। এই সময়ের সোনা ও ব্রঞ্জের গহনার অনেক প্রাচীন চিহ্ন ও আবিষ্কৃত হয়েছে। সে যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য যানবাহন তৈরি করা হয়েছিল। জলপথে কাঠের নৌকা ব্যবহারও চালু হয়।

জীবনযাত্রা প্রণালীর বৈচিত্র্য—কাজকাম বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তামা ও ব্রঞ্জ যুগে পেশাগত বৈচিত্র্য দেখা গেল। লোকসংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, কৃষির উৎপাদন ও কারিগরি শিল্পের উৎপাদনও তেমনি বেড়ে চলল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় বাড়তি জিনিস অন্য স্থানে রপ্তানি হতে লাগল বা এক জায়গায় অভাব হলে অন্য অঞ্চল থেকে তা আমদানি করা হত। উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র সঞ্চয়ের দিকেও লোকের ঝোঁক হয়। ব্রঞ্জের তৈরি নানা অস্ত্রশস্ত্র ও গহনাপত্র, কাপড়-চোপড় ও নকশা-করা জিনিসপত্র, মায় সোনারূপোর অলংকার—এসব তৈরির জন্য কারিগরি কাজের নানা পেশাগত শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। ছুতোর, মিস্ত্রী, কুমোর, তাঁতি—এমন নানাবিধ পেশায় লোক উপায়-উপার্জন করত। ধাতুর সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পেশার ক্ষেত্রে ক্রমশই নতুন নতুন সুযোগ আসে।

নদী-উপত্যকায় সভ্যতা শুরুর গুরুত্ব—নদীর নিকটবর্তী উপত্যকাতে চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য—এই সবের খুবই সুবিধে। তাই নদী-উপত্যকা-নির্ভর সভ্যতার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রাচীন কালে গ্রাম বা নগর সভ্যতার যে পত্তন হয়, তা প্রায়ই বড় বড় নদীর উপত্যকায় গড়ে ওঠে। বার্ষিক বন্যার ফলে নদীর পাড়ের অঞ্চলে পলিমাটি পড়ে। তাতে জমি উর্বর হয়। চাষবাসের সুযোগ

সেখানেই বেশি। নদীর তীরে ও চরে পশুপালনেরও সুবিধে। মেসোপটেমিয়ায়, মিশরে, ভারতে সিন্ধুপ্রদেশে ও চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতা নদী-উপত্যকাতেই গড়ে উঠেছিল। ক্রমে সে সব স্থানে নগরসভ্যতার পত্তন হয়।

তামা ও ব্রঞ্জের যুগে নানা কারিগরি শিল্পের প্রসারের ফলে নদী-উপত্যকার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। সেখানে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা খুবই সুবিধের ছিল সন্দেহ নাই।

গোষ্ঠীতন্ত্র—নানা পেশায় ও বৃত্তিতে ধাতুর যুগে শ্রেণীভেদের সূচনা হয়। কিন্তু কৃষিকাজের সময় থেকেই মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা জাগে। মানুষ তখন থেকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপন করে। এক এক গোষ্ঠীর লোক সবাই মিলে মিশে কাজকর্ম করতে থাকে। ধাতুর যুগে কাজকর্মের বিভিন্নতা বাড়ে, কিন্তু এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে মূলগত ঐক্যবোধ থাকে। সেটা শুরু হয় এই কারণে যে, সেই সব এক এক দলের উপর এক একজন মোড়ল বা প্রধান থাকত। তাদের আদেশ ও শাসন মেনেই আর সকলে চলত। যারা বাইরে থেকে এসে তাদের উপর হামলা করত, তাদের বিরুদ্ধে সেই গোষ্ঠীর লোকেরা দলপতির অধীন হয়ে লড়াই করত। প্রাচীনকালে যারা ঘুরে ঘুরে বেড়াত, কৃষির সুযোগ সত্ত্বেও তাদের কেউ কেউ যাযাবর বৃত্তি ছাড়ে নি। তারা কিন্তু গ্রামবাসীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে জমি ও ফসলের দাবী করত। কখনো আবার নিজেদের মধ্যেও ঝগড়া বাধত। এই ভাবে গোষ্ঠীবিবাদ শুরু হয়। যাদের শক্তি ছিল বেশি, লড়াইয়ে তাদের জয় হত। আর পরাজিত গোষ্ঠীর লোকেরা বন্দী হয়ে বিজেতা দলের অধীনে দাসের মত শ্রমের কাজ করত। নিজেদের রক্ষার তাগিদে গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের প্রধানকে মদত দিত। একজনের কর্তৃত্ব বা শাসন মেনে চলার এই যে রীতি, তা থেকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার শুরু হয়। কালক্রমে এক এক অঞ্চলের নেতা বা প্রধানরা ছোট ছোট রাজার মত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে সাহায্য করার জন্য দলের লোকজন সদাই প্রস্তুত থাকত। এইভাবে সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে রাজতন্ত্রের

সূচনা হয়। কিন্তু কালের প্রভাবে আজকের পৃথিবীতে রাজতন্ত্রের পুরানো কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রায় বেশির ভাগ দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। লোকে এখন নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদেরকে দিয়ে শাসন পরিচালনা করে।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। তামা-ও-ব্রঞ্জযুগের বৈশিষ্ট্য কি ?

২। নগর-সভ্যতার পত্তন সম্বন্ধে কি জান ?

৩। ধাতুযুগে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। তামা ও ব্রঞ্জযুগের জীবনধারার বৈচিত্র্য আলোচনা কর।

২। গোষ্ঠীবিবাদ কেন হয় ?

৩। রাষ্ট্রচেতনার সূচনা কি ভাবে হয় ?

৪। নদী-উপত্যকায় সভ্যতার গুরুত্ব স্বীকার করা হয় কেন ?

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। তাম্র-ও-ব্রঞ্জযুগের আবির্ভাব হয় কবে ?

২। তাম্র ও ব্রঞ্জযুগে কারিগরি শিক্ষা বাড়ে কেন ?

৩। গোষ্ঠীবিবাদে পরাজিত গোষ্ঠীর অবস্থা কিরূপ হয় বল।

[ঘ] বস্তুধর্মী প্রশ্ন :

১। নিম্নের উক্তিগুলির কোনটা ঠিক বা কোনটা বেঠিক ? ঠিক উক্তির পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও, বেঠিক উক্তির পাশে কাটা চিহ্ন (×) দাও :

(ক) ব্রঞ্জের গড়া অস্ত্রশস্ত্র তামার অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে বেশি মজবুত নয়।

(খ) তামা-ও-ব্রঞ্জযুগে পেশাগত বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিল।

(গ) কৃষিকাজ থেকেই গোষ্ঠীচেতনা জাগে।

(ঘ) নদী-উপত্যকায় প্রথম থেকেই নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে।

অধ্যায়

৪

॥ সভ্যতার প্রথম বিকাশ ॥

বহু চেষ্টায় মানুষ ধীরে ধীরে সভ্যতার পথে পদক্ষেপ করে। কৃষি-কাজ শেখার সঙ্গে তাদের জীবনধারার আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। এর আগে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে খাদ্যের খোঁজে। কোথাও স্থির হয়ে থাকেনি। এবার হাত দিয়েছে খাদ্য উৎপাদনের কাজে। সে কাজ হল কৃষিকাজ। নদীর তীরেই সে কাজের সুযোগ বেশি।

চাষের কাজে জল লাগে। সে সুবিধে নদীতীরে আছে। নদীর পাড়ে পলিপড়া জমি উর্বর হয়। বীজ বুনলে অল্প আয়াসেই ফসল ফলে। সে ফসল হয়ও পর্যাপ্ত। ফসলে খাবার অভাব মেটে। সঙ্গের গরু ভেড়া প্রভৃতি পশুদের ঘাসজলও সেখানে মেলে। চাষ আবাদের জন্য নদীর পাড়ে লোকে স্থায়ী বসতি গড়ে। ঘর বেঁধে বাস করে, মিলে মিশে কৃষিকাজ চালায়। সমাজে স্থিতি-স্থাপকতার সূচনা হয়। সভ্যতার গোড়া পত্তন হয়।

আজ থেকে প্রায় পাঁচছয় হাজার বছর আগে এই ধরনের সভ্যতার পত্তন হয়। সেগুলি সব নদীর তীরে গড়ে ওঠে। ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস—এই দুই নদীর তীরের মধ্যবর্তী অঞ্চল মেসোপটেমিয়ায়, নীলনদের পাড়ে মিশরে, ভারতে সিন্ধুনদের কূলে, এবং চীনে ইয়াং-সিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর তীরে প্রথম এই সভ্যতার শুরু হয়। সভ্যতার সেই আলো সে সব স্থানে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়। কালে গড়ে ওঠে গ্রাম, গঞ্জ, শহর ও বন্দর। হতে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজ্যপাট, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির রকমারি ব্যবস্থা।

এবার নদী-উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলির সেই ইতিহাসের কথাই তোমরা শুনবে। তাদের মধ্যে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা সব চাইতে পুরানো। প্রাচীন সভ্যতার সেই চারটি কেন্দ্রের মানচিত্রে দেখতে পাবে নদনদীর উপত্যকাতেই সেগুলি গড়ে উঠেছিল।

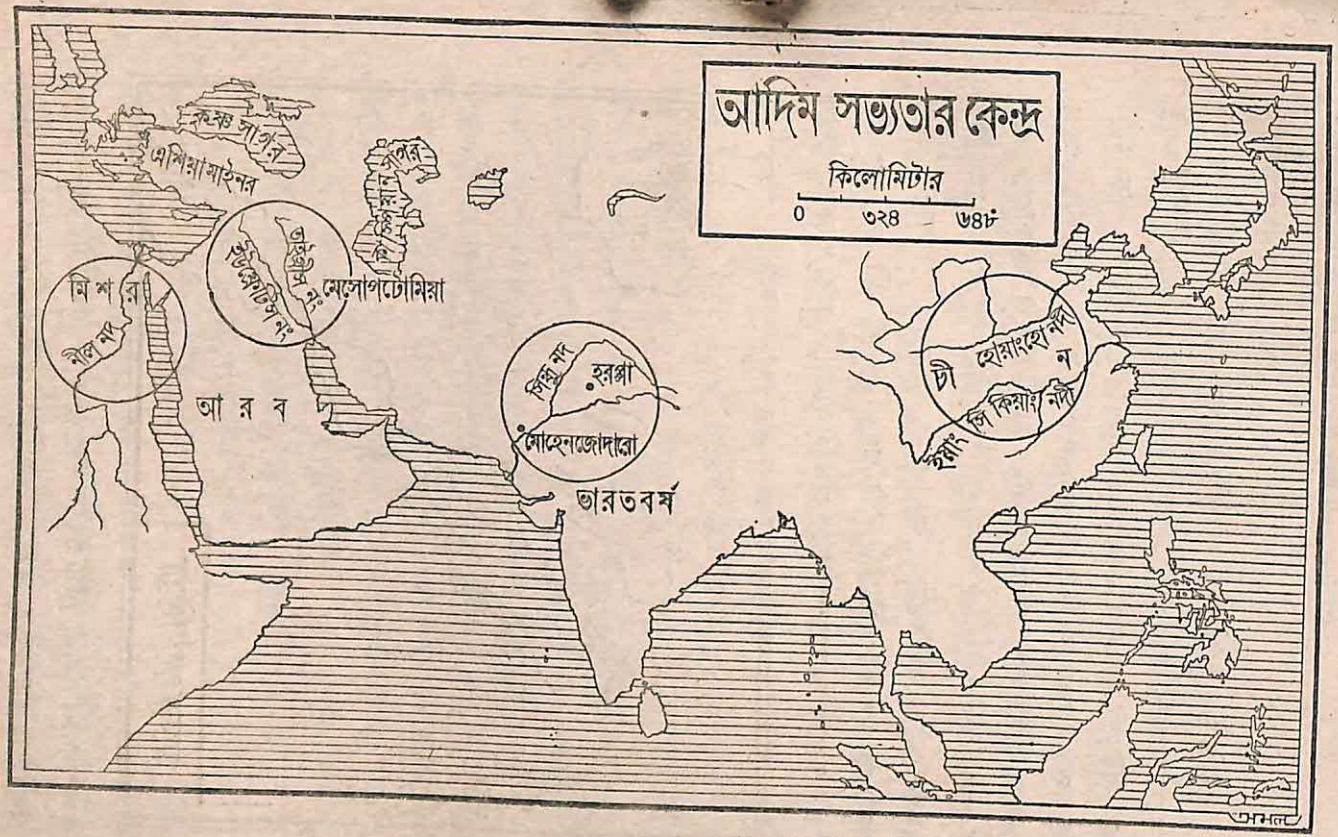

আদিম সভ্যতার কেন্দ্র
কিলোমিটার
0 ৩২৪ ৬৪৮
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়ামাইনর
মিশর
নীল নদ
আরব
ইউফ্রেটিস নঃ
মেসোপটেমিয়া
সিন্ধু নদ
হরপ্পা
মোহেনজোদারো
ভারতবর্ষ
হোয়াংহো নদী
চীন
কিয়াং নদী
অমল

(ক) মেসোপটেমিয়া

অবস্থিতি—ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী এই অঞ্চলের নাম মেসোপটেমিয়া। এই নাম প্রাচীন গ্রীকদের দেওয়া। শব্দটির অর্থই হল—দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। এর বর্তমান নাম ইরাক। বহু আগে এই অঞ্চলের কি নাম ছিল, তা এখনও অজানা। এখানকার প্রথম সভ্যতার ইতিহাস সব চাইতে প্রাচীন। অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে বা তারও বেশ আগে এর পত্তন হয়। প্রাচীন ভগ্নস্তূপ ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সেই সভ্যতার কথা জানা গিয়েছে। মেসোপটেমিয়ার মানচিত্রে দেখ ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস—এই দুই নদী এই অঞ্চলটির দু পাশে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বয়ে গিয়েছে। তারা পড়েছে পারস্য

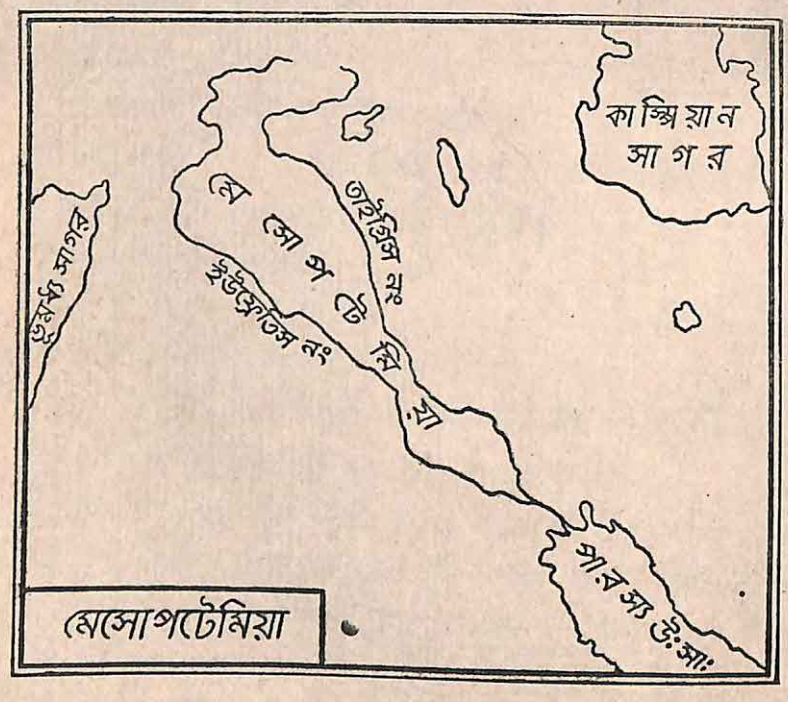

উপসাগরে। নদী দুইটি যেন যমজ বোন, স্নেহধারার মত তাদের জলধারায় অঞ্চলটিকে কত সিক্ত করেছে। পলিমাটির স্তর দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে তার বুক। প্রাচীন কালে সুমেরীয়রা পলিমাটির এই উর্বর দেশে এসে চাষবাস করে। তারা কোথেকে আসে তা নিয়ে মতভেদ

আছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সুমেরীয়রাই এখানে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তোলে। তখন তাদের নামেই অঞ্চলটির নাম হয় সুমের।

এখানকার উর্বরতা ছিল অসম্ভব রকমের। জলাভূমি ও জঙ্গলে ফল হত প্রচুর—খেজুর, ডালিম, ডুমুর ও আঙ্গুর এমন কত কি। বীজ বুনলে সহজেই ফসল হত। ফসল পাওয়াও যেত প্রচুর। এখানে বৃষ্টি কম হলেও নদীর মিষ্টি জল বার মাসই পাওয়া যেত। বছর বছর বন্যার জলে লোকের কষ্ট হলেও জমিতে পলি পড়ায় জমির উর্বরতা বেড়েই যেত। ফসলের চাষ হত পর্যাপ্ত।

বন্যা প্রতিরোধ ও সেচব্যবস্থা—দুই দিকে দুই নদীর উপচে-পড়া বন্যার জলে বছর বছর লোকের কত কষ্টই না হত। বন্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সুমেরীয়রা বড় বড় গাছ, পাথর ও পাকা ইট দিয়ে বাঁধ তৈরি করত। বাঁধ থেকে খাল কেটে দেশের মাঝখান অবধি জল নিয়ে যেত। খালের সেই জলে তারা সারা বছর জমিতে সেচ দিত। তাতে চাষের ক্ষেত্র ও সুযোগ বেড়েই যেত। ফলে তাদের কোন দিন খাদ্যের অভাব হয় নি। খাল কেটে বাঁধের জলের সাহায্যে সেচব্যবস্থায় সুমেরীয়দের কৃতিত্ব খুবই প্রশংসনীয়। সে আমলে তারাই সম্ভবত সেচব্যবস্থার অগ্রদূত। বন্যা প্রতিরোধে বাঁধের গুরুত্ব বেশি, তাই বাঁধ রক্ষার কাজে পাহারার বন্দোবস্তও তারা করেছিল। বাঁধের কোথাও ফাটল দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা মেরামত করা হত। বাঁধ বা খালের জলের যারা ক্ষতি করত, তারা রাজার কাছ থেকে সাজা পেত। এ থেকে বোঝা যায় দেশের সুব্যবস্থার জন্য তখন থেকেই মেসোপটেমিয়ার লোকেদের কি আগ্রহই না ছিল।

উপজীবিকা ও পেশা—তাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। তবে মাটির বাসনকোসন গড়া, চাষের যন্ত্রপাতি তৈরি, তামা ও ব্রঞ্জ দিয়ে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র গড়া ও পরবার জন্য জামাকাপড় তৈরির কাজ, সোনা-রূপোর গহনা তৈরি ও ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ—এই রকম নানা বৃত্তি ও পেশার কাজেও অনেকে নিযুক্ত থাকত। এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন খুব বেশি হয়। এখান থেকে

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 10 7 89
S.C.E.R.T., West Bengal Library

কাঠ ও কাঠের তৈরি বাসনপত্র ও খাদ্যসামগ্রী দূর দূরান্তরে চালান যেত। বণিকের দল স্থলপথে গাধা বা উটের পিঠে মাল চাপিয়ে ব্যবসা করতে যেত। পশুতে টানা গাড়িতে করেও ব্যবসা করতে যেত। মাল বহার কাজে চাকাওয়ালা গাড়ি তারা ব্যবহার করত। ডিঙি নৌকো করে জলপথে দেশের বাহিরেও তারা ব্যবসা করত। 'উর্' অঞ্চলে মাটি খুড়ে হরপ্পার জিনিসপত্রের নমুনা পাওয়া গিয়েছে, আবার মহেন-জো-দারোতে পাওয়া গিয়েছে মেসোপটেমিয়ারজিনিস। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতের সঙ্গে তখন এই দেশের ব্যবসার সম্পর্ক ছিল। এখানকার লোক প্রথম কাঁচের বাসন তৈরি করতে শেখে। এখানে নানা ধরনের কারিগর ছিল। ঘর তৈরি, বাঁধ তৈরি বা মন্দির তৈরির কাজেও দক্ষ কারিগর পাওয়া যেত।

সমাজব্যবস্থা—সমাজে রাজা ছিলেন প্রধান। প্রত্যেক নগরে এক এক জন রাজা ছিলেন। তিনিই নগর শাসন করতেন। পুরোহিতরা তাঁদের খুব সাহায্য করতেন। পুরোহিতদের পরেই ছিল রাজকর্মচারী, শিক্ষক, বণিক, কারিগর ও চাষী। ক্রীতদাস ছিল সবার নীচু স্তরে। তারা জমিচাষ ও বাড়ীর কাজকর্ম করত। বিভিন্ন নগরের যারা সব শাসক বা রাজা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়াবিবাদ হত। নদীর বা খালের জল নিয়েও ঝগড়া হত। ফলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধত। এক এক রাজার অধীন সেনাদল থাকত। বর্শা, কুড়ুল, গদা ছিল তাদের প্রধান হাতিয়ার। তারা তামার শিরস্ত্রাণ পরে ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। রাজারা রথে চেপে যুদ্ধ করতেন। ঘোড়া থাকত সে সব রথের বাহন। অবশ্য এদেশে ঘোড়ার ব্যবহার হয় বেশ পরের দিকে।

মেসোপটেমিয়ার বাসিন্দাদের কৃতিত্ব—প্রাচীন অধিবাসী সুমেরীয়রা বেশ সভ্য ও ভব্য ছিল। তারা বেশির ভাগ নগর তৈরি করেই বাস করত। তাদের আদি সভ্যতার যে সব চিহ্ন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে, তাতে বোঝা যায় নগরসভ্যতা বেশ উন্নতই ছিল। উর্, এরিক প্রভৃতি রাষ্ট্রনগরীর নিদর্শন তার প্রমাণ। অনেকে মনে করেন

—এই নগরগুলি ছিল বিভিন্ন বণিক জাতির লোকেদের উপনিবেশ। নগরগুলো ছিল বেশ সুন্দর ও সুসজ্জিত। বড় বড় দালানকোঠা বা অট্টালিকার জাঁকজমক ছিল যথেষ্ট। পোড়া মাটির ইট দিয়ে তারা জিগ্‌গুরাট নামে এক ধরনের বেশ শক্ত ও উঁচু মন্দির বানাত। অনেক দূর থেকে সে মন্দির দেখা যেত। এগুলি ছিল যেন এক একটা দুর্গ। এর মধ্যে শস্যের গোলা থেকে অস্ত্রাগার পর্যন্ত থাকত। অবশ্য মন্দির তৈরিতে পাথরের ব্যবহার তাদের মধ্যে তেমন ছিল না। তারা অন্য দেশে ব্যবসা করতে যেয়ে সেখান থেকে কিছু পাথর নিয়ে আসত। কারিগররা তা দিয়ে বাসনপত্র, ও জীবজন্তুর সুন্দর মূর্ত্তি তৈরি করত। মন্দিরের গায়ে সে সব মূর্ত্তি শোভা পেত।

সুমেরীয়রা গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যায় দক্ষ ছিল। আকাশের তারা ও গ্রহগুলির পরিচয় তারা দিত। চাঁদের তিথির সংখ্যা দিয়ে তারা মাস গণনা করত। তারা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত। তাদের সে শিল্প-কর্মের নমুনা দেখলে অবাক হতে হয়। নানা রঙ দিয়ে আঁকা সেসব ছবি। দেওয়ালে এক রকম কাগজের মত জিনিস এঁটে তার ওপরে মনের খেয়াল-খুশিতে তারা ছবি আঁকত। এসব দেওয়াল চিত্র আজকের দিনের 'ফ্রেসকো' বা প্রাচীরচিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুমেরীয়দের এই সব নানা কৃতত্বের কথা শোনবার মত।

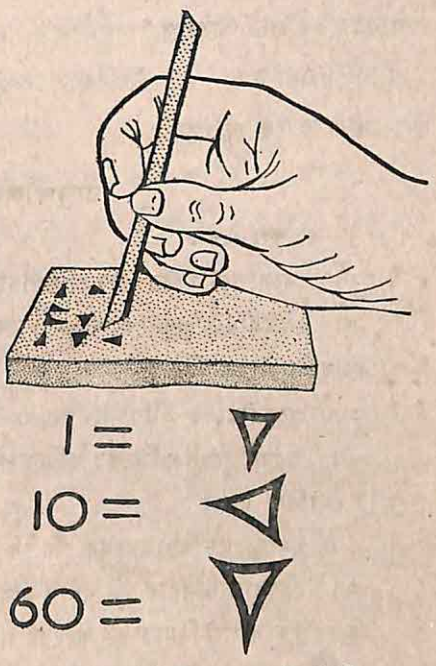

কিউনিফর্ম লিপি ও সংখ্যার লিপি

লিপির প্রবর্তন—সেকালের লোক ছবি এঁকে মনের ভাব ফুটিয়ে তুলত। তারই ফলে গুহাচিত্র বা প্রাচীরচিত্রের শুরু। সব সময়ে

সে সব ছবি যে খুব ভাল হত তা নয়। তবে তা দিয়ে মনের ভাব বোঝান হত। পরে কোন সময়ে সুমেরীয়দের মধ্যে এক ধরনের লিপি গড়ে ওঠে, যার ওপরে মিশরের চিত্রলিপির কিছুটা প্রভাব আছে মনে হয়। এরা কাঁচা মাটির ফলকে ধাতুর কলম বা নল-খাগড়ার মত কলম দিয়ে কোণাকারে দাগ কেটে লিখত। পরে সে গুলি রোদ্দুরে বা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত। এই ধরনের লেখাকে বলা হত **কিউনিফর্ম** লিপি।

ধর্মবিশ্বাস—মেসোপটেমিয়ার লোকরা দেবদেবী পূজো করত। প্রত্যেক নগরের একটা দেবতা থাকত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে সেই দেবতাই তাদের নগর রক্ষা করত। রাজাকে দেবতার প্রতিনিধি মনে করা হত। রাজা ছিলেন নগরের প্রধান পুরোহিত। তারা মৃতদেহকে মাটির নীচে রেখে দিত। মানুষের সমাধির মধ্যে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গহনাপত্র, মায় খাবারসামগ্রী নানা পাত্রে করে দেওয়া হত। তারা বিশ্বাস করত যে পরলোকে মৃত ব্যক্তির সেগুলি কাজে লাগবে।

অনুশীলনী

[ক] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা কোথায় এবং কি ভাবে সৃষ্টি হয় ?

২। সুমেরীয়রা বন্যা থেকে কি ভাবে বাঁচত এবং জলসেচের ব্যবস্থা তাদের মধ্যে কেমন ছিল ?

৩। সুমেরীয়দের জীবিকা, শিল্প ও সমাজব্যবস্থা যা জান লেখ।

৪। সুমেরীয়দের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

[খ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। মেসোপটেমিয়া নামের অর্থ কি ?

৩। মেসোপটেমিয়ার দুই নদীর নাম কি ?

৪। মেসোপটেমিয়ার দুই শহরের নাম বল।

৫। মেসোপটেমিয়া থেকে কি কি জিনিস বাইরে যেত।

৬। সুমেরীয়রা কি বিশেষ জিনিস প্রথম আবিষ্কার করে।

৭। কিউনিফর্ম লিপি কি ?

[গ] বস্তুধর্মী প্রশ্ন :

১। ভুল সংশোধন কর : (ক) জিগ্‌গুরাট দেবতার নাম। (খ) মেসোপটেমিয়ার রাজা ছিল সমগ্র দেশের শাসক। (গ) সুমেরীয়রা গণিত বিদ্যা জানত না। (ঘ) মৃত ব্যক্তির দেহ তারা পুড়িয়ে দিত।

২। বাঁ ও ডান দিকের বাক্যগুলির মধ্যে মিল করে সাজাও :

১। কিউনিফর্ম	১। বন্যা প্রতিরোধের উপায়
২। জলের বাঁধ ছিল	২। নগরদেবতার মন্দির
৩। নগররাষ্ট্র	৩। শাসন করত রাজা
৪। জিগ্‌গুরাট	৪। এক প্রকার লিপি

(খ) মিশর (ইজিপ্ট)

অবস্থিতি—মিশর দেশটির অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশে। সেই মহাদেশের বিশাল মরুভূমি সাহারা পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মরুভূমি। সেই মরুভূমির উত্তর-পূর্ব কোনে ভূমধ্যসাগর-ছোওয়া একটি অঞ্চল—যার মধ্য দিয়ে নীলনদ বয়ে চলেছে—তারই নাম মিশর। দেশের দু পাশে পাহাড়-পর্বত আর বালিয়াড়ি। মিশরের দক্ষিণ অংশে দুর্ভেদ্য গভীর জঙ্গল। মধ্য আফ্রিকা থেকে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নীল নদ মিশরে প্রবেশ করেছে, আর পড়েছে ভূমধ্যসাগরে।

মরুভূমির প্রভাবে মিশরের সাধারণ আবহাওয়া শুকনো ও গরম। বৃষ্টিপাতও এখানে কম। কিন্তু নীলনদের তীরের জায়গাগুলি অন্য ধাঁচের। মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার বরফগলা জল ও জলপ্রপাতের ধারায় স্ফীত হয়ে নীলনদ প্রতি বছর দুকূল ভাসিয়ে দেয়। সেই বানের জলে নীলনদের পাড়ে মিশরে পলি মাটি পড়ে। তাতে জমি হয় উর্বর ও সরস, কৃষির পক্ষে উপযোগী। তাই অতি প্রাচীন কালেই মানুষ নীলনদের তীরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে কৃষিকাজ করে অজস্র ফসল ফলিয়েছে। ঘরবাড়ি বানিয়েছে। সভ্যতার মূল ভিত তৈরি করেছে। মিশরে নীল নদ ছাড়া আর কোন নদী নেই। মিশরের যা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের

গড়া সমৃদ্ধি, সে সব ঘটেছিল নীলনদের কৃপাতে। তাই মিশরকে বলা হয়—নীলনদের দান।

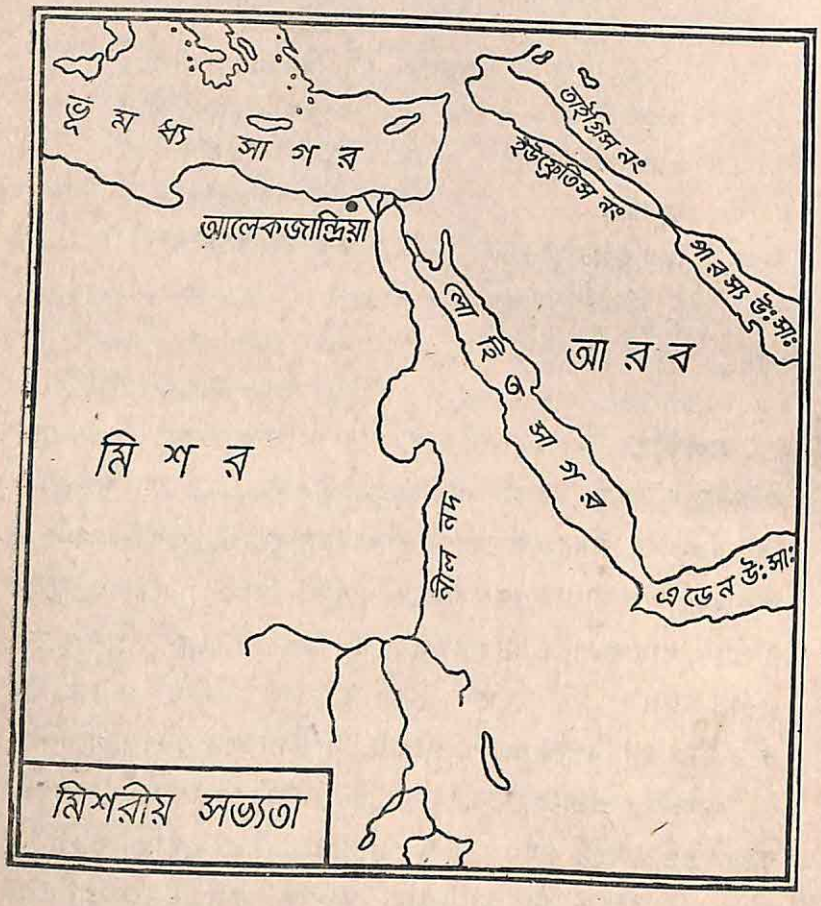

প্রাচীন মিশরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগের কথা। আজ যারা মিশরের অধিবাসী, প্রাচীন সভ্যতা কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষরা গড়ে নি পণ্ডিতরা অনুমান করেন প্রাচীন কালে এডেন উপসাগরের পথে একদল মানুষ নীলনদের তীরে এসে বসতি স্থাপন করে। পরে ক্রমশ হিক্‌শস (Hyksos), আসিরীয়, পারসী, গ্রীক ও রোমানরা আসে। অনেক কাল ধরে পরপর তারা সেখানে রাজত্ব করে। শেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আসে আরবের

মুসলমানরা। মিশরীয়রা তখন ইসলাম ধর্ম নিয়ে আরবীয় মুসলমানে পরিণত হয়। আজ তারাই এখানকার অধিবাসী ও সর্বময় কর্তা।

ফ্যারাও—মিশরে গোড়ার দিকে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। রাজ্যগুলির কর্তৃত্ব করত এক এক জন রাজা। তাদের রাজধানী ও দেবদেবী ছিল আলাদা। তাদের মধ্যে সকলেরই লোভ ছিল নীলনদের জলের ওপর। তাই যে রাজা যতখানি নদীর তীর দখল করতে পারত, রাজ্যের পরিচয় ও সমৃদ্ধি তার ততখানি বাড়ত। এ নিয়ে সেকালে রাজায় রাজায় প্রায় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। তার ফলে রাজারা দুর্বল হয়ে পড়ে। মিশর দেশের গোটা অঞ্চলটাই পরে এক প্রবল রাজার অধীনে আসে। সেই রাজাকে বলা হত 'ফ্যারাও'। ফ্যারাও কথাটির অর্থ হল—'বড় বাড়ি', তাই থেকে বড় বাড়ির মালিক।

রাজারা বাস করতেন বড় বড় প্রাসাদে। সম্ভবত এই কারণেই তাঁদের নাম ফ্যারাও। ফ্যারাও-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার আগে নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য ছিল না। ফলে নীলনদের বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা জরুরী হলেও যৌথ কোন চেষ্টা সম্ভবপর হয় নি। ফ্যারাওয়ের রাজত্বে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছিল। দুর্ধর্ষ হিক্‌শস জাতি আরব থেকে এসে কিছু কাল মিশরে রাজত্ব করে। তারা ছিল অত্যাচারী। লোকে তাদেরকে পরে মিশর থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফ্যারাওরা তার পর থেকে শক্ত সৈন্যবাহিনী রাখতে থাকেন। হিক্‌শসরাই মিশরে প্রথম ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলন করে। ফ্যারাওদের সৈন্যদলে ঘোড়সওয়ার, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য থাকত। মিশরের সম্রাট তৃতীয় থুথুমেস্ ভূমধ্যসাগরে নৌবাহিনী গড়ে তোলেন, তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন এবং পশ্চিম এশিয়ার অনেক রাজ্য দখল করেন।

মিশরে ফ্যারাওদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। মিশর-বাসী মনে করত তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁরা ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। দেশে যা কিছু উৎপন্ন হত, তার অংশ তাঁরা পেতেন, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ভাগ তাঁদের প্রাপ্য ছিল। তাঁরা প্রচুর ঐশ্বর্য ভোগ করতেন। বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিলেন।

কর ও শাসন ব্যবস্থা—সাম্রাজ্য বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মিশরকে চল্লিশটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। এক এক অঞ্চলের জন্য শাসক নিযুক্ত হয়, কর আদায় ছিল তাদের প্রধান কাজ। তাদেরকে সাহায্য করত রাজকর্মচারীরা। ফ্যারাওদের আত্মীয়স্বজন বড় বড় সম্পত্তির অধিকারী হতেন। ফ্যারাওদের প্রাপ্য কর ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের ছয় ভাগের এক ভাগ। তাঁদের কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ হত। ব্যবসা-বাণিজ্য সব সম্রাটদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফ্যারাওরা প্রায় তিন হাজার বছর একাদিক্রমে রাজত্ব করেছেন। পর পর ত্রিশটি বংশ মিশরের সিংহাসনে বসেছিলেন। এ বড় কম কথা নয়। মিশরবাসীরা তাঁদেরকে অসম্ভব রকমের শ্রদ্ধা করত। মিশরীয়রা ধীর, শান্ত ও ধর্মভীরু ছিল। ফলে এত দীর্ঘকাল ফ্যারাওদের শাসন বজায় ছিল।

পুরোহিত, যোদ্ধা ও নানা কাজকর্মের লোক—মিশরের সমাজে নানা পেশা ছিল। তবে জাতিভেদ ছিল না। রাজাদের নীচে সব চেয়ে মানী লোক ছিলেন পুরোহিতরা। তাঁরা দেবসেবা করতেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যা চর্চা করতেন। তারা ধর্মকার্যের তত্ত্বাবধান করতেন। লেখাপড়া শেখানর ভার তাঁদের উপর ছিল। তাঁদের কর দিতে হত না। তাঁরা নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ—এ সব বিষয়ে তাঁদের বিশেষ দান আছে। চাঁদের তিথি অনুসারে মাস গণনার প্রথা তাঁরা শেষ অবধি ছেড়ে দেন। ত্রিশ দিন হিসাবে মাস গণনা করে তার সঙ্গে পাঁচ যোগে ৩৬৫ দিনে বছর ধরেন। গণিতের ভগ্নাংশ তাঁদের একটা আবিষ্কার। সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। প্রজারা পুরোহিতদের কথায় বিশ্বাস করে পরলোকের ভয়ে শান্ত থাকত। এর ফলে সমাজে সাধারণ লোকদের মধ্যে পাপ করার ঝোঁক কম ছিল।

পুরোহিতদের আর এক কৃতিত্ব 'মমি' তৈরির কৌশল। মৃতদেহের ওপরে তাঁরা নানা প্রকার ঔষধের প্রলেপ দিতেন। যুগ যুগ সেগুলিকে

পচনের হাত থেকে রক্ষা করতেন। তাঁরা মনে করতেন দেহ যদি গলে পচে নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে পরলোকে জীবন শুরু হতে পারে না। তাই বড় বড় রাজাদেরকে মমি করে পাহাড়ের গর্তে বা সমাধিতে রাখা হত। প্রথমে মড়া মানুষের পেটের নাড়িভুঁড়ি ও মাথার ঘেলু সব বের করা হত। পরে দেহটাকে মসৃণ কাপড়ের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা হত। ওষুধে ডুবিয়ে পরে আস্তরণের ওপর ওষুধের প্রলেপ দিয়ে রাখা হত। কলকাতার যাদুঘরে মিশরের এমন একটা মমি রাখা আছে।

মিশরের মমি

মিশরের চিকিৎসা-বিদ্যার প্রচলন ছিল। তারা চিকিৎসার ব্যাপারে অস্ত্রবিদ্যাও জানত। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন থেকে চিকিৎসার জন্য তাদের ডাক আসত। তাদের চিকিৎসার মধ্যে মন্ত্র, মাদুলি, তুকতাক—এই সবও ছিল।

পুরোহিতদের পরেই ছিল যোদ্ধার দল। পদাতিক, রথী ও ঘোড়সওয়ার হিসাবে যোদ্ধারা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাদের মর্যাদা যথেষ্ট ছিল। যুদ্ধবিগ্রহে ও শান্তিরক্ষার কাজে তাদের ভূমিকা ছিল। তাদের নীচে ছিল কৃষকসমাজ। এদের মানমর্যাদা বেশি না থাকলেও নীলনদের উপত্যকার সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষকরা। অতএব তারা ছিল সমাজের মেরুদণ্ড—এতে সন্দেহ নেই। তাই কৃষকদের নীচে শিল্পী ও ব্যবসায়ীর স্থান ছিল। অবশ্য বড় বড় ব্যবসায়ীদের কথা ছিল পৃথক। শিল্পের কাজে নানা শ্রেণী গড়ে ওঠে। বাসন ও কাঁচের তৈজসপত্র তৈরির শিল্পী থেকে কাঠের মিস্ত্রী, জহুরী, স্যাকরা, তাঁতি, হাতীর দাতের ও কাগজের শিল্পী—এমন কত কারিগর ছিল। জেলে, রাখাল, দাস—এরা ছিল শেষ ধাপে। মিশরে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। পরাজিত দেশের লোকেরা দাসে পরিণত হত।

মিশরের যোদ্ধারা তীর ধনুক বর্শা কুড়ুল ও তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ

করত। গায়ের ওপর তারা বর্ম-পোষাক পরত। পাথরের বেশ সরু ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রও হাতল লাগিয়ে ব্যবহার করা হত। পরের দিকে হিক্‌শসদের কাছ থেকে এরা ঘোড়া ও লোহার অস্ত্রের ব্যবহার শেখে।

লিপি, পুঁথিলেখক ও চিঠিপত্র—আমরা বলেছি যে সভ্যতার আদি যুগে লিপির ব্যবহার ছিল না। মানুষ তখন ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত, আর পাহাড় বা প্রাচীরের গায়ে সেই নিদর্শন ধরে রাখত। কালে ছবির বদলে প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়। মিশর এ বিষয়ে ছিল অগ্রণী। মিশরীয়দের সেই আবিষ্কার **হায়ারোগ্লিফিক** (Hieroyglyphic) লিপি নামে পরিচিত। এতে ছবির প্রতীক চিহ্নের

হায়ারোগ্লিফিক লিপি

গুরুত্ব আছে। এক একটা চিহ্ন বা সংকেত দিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনি বোঝান হত। কখনো কখনো একাধিক চিহ্ন দিয়ে মাত্র একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিচয় দেওয়া হত। আবার কখনো কখনো কতকগুলি চিহ্ন দিয়ে একের বেশি সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি প্রকাশ করা হত। ক্রমে মিশরীয়রা এই লিপির সংস্কার করে। তারা ধ্বনিচিহ্নের সংখ্যা যতটা সম্ভব কমিয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিশরের লিপির মূল চরিত্রের বদল হয় নি। পরে তার আর বর্ণমালায় রূপান্তর ঘটে নি।

কালক্রমে মিশরের প্রাচীন সভ্যতা লোপ পায়। সেদিনের পরে অনেক কাল কেটে গিয়েছে। সে লিপি বোঝবার কেও থাকে নি। সে ভাষা বলবার লোকও থাকে নি। এখন থেকে প্রায় পৌনে দুই শ' বছর আগে নেপোলিয়ান দিগ্বিজয়ে বের হন। তিনি মিশর জয়

করতে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁর সৈন্যদল নীলনদের রসেটা মোহনায় পরিখা খুঁড়তে গিয়ে মিশরীয় শিলালিপি পান। সেই লিপির সঙ্গে গ্রীক লিপির কিছুটা মিল আছে, এক গ্রীক সামরিক কর্মচারী সেটা বুঝতে পারেন। শাঁপলিয়ঁ (Champlion) নামে এক ফরাসী অধ্যাপক অনেক চেষ্টা ও শ্রম করে সে লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তাঁর পদ্ধতি অনুসারেই আরও অনেক লিপির অর্থ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

কাগজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মিশরীয়রা অগ্রদূত। তারাই 'পাপাইরাস' (papyrus) বা শরজাতীয় গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরি করতে শেখে। 'পাপাইরাস' শব্দ থেকেই ইংরাজীতে 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি।

প্রাচীরের গায়ে লেখা লিপি ও ছবি দেখে পণ্ডিতরা মিশরীয়দের অনেক কথা জানতে পেরেছেন। হিটাইতদের সঙ্গে মিশরীয়দের অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলে। উভয় রাজ্যের মধ্যে সে সময় অনেক চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়। চিঠিগুলি কাদার পাটার উপর খোদাই করে লেখা। সেই সব চিঠিপত্র এবং পুরোহিতদের লেখা পুঁথিপত্র থেকে পুরানো দিনের সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় মেলে। সেকালের পত্র-লেখকরা যথেষ্ট কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ফ্যারাওদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের রাজাদের পত্র বিনিময় হত। ব্যবসাবাণিজ্যের হিসাবনিকাশ লিখে রাখবার জন্যও পেশাদার লেখক থাকত। তারা সেই কাজের জন্য মজুরি পেত।

ব্যবসা-বাণিজ্য--মিশরসভ্যতার প্রথম যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ। কিন্তু নীলনদের তীরে চাষবাসের ফলে শস্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়। উদ্বৃত্ত গমের ফসল ডিঙ্গি নৌকা বোঝাই দিয়ে ব্যবসায়ীরা গেল ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের তীরে। বিদেশ থেকে গম বেচে তারা নিয়ে এল জলপাইয়ের তেল, লবণ ও আরও কত কি। বিদেশে ব্যবসার জন্য মিশরীয়রাই প্রথম জলজাহাজ নির্মাণ করে। তারা গম, বস্ত্র, কাঁচের জিনিস, কাঠের আসবাব-পত্র—এই

সব চালান দিত। মিশরীয়রা মিহি কাপড়, ধাতুর কারুকার্য খচিত জিনিস ও চামড়ার জিনিসপত্র তৈরিতে দক্ষ ছিল। সেই সব জিনিসও তারা বিদেশে রপ্তানি করত। মিশরের কবরে ভারতীয় সেগুন কাঠের আসবাব ও সুতীর কাপড় পাওয়া গিয়েছে। মিশরে স্থলপথেও বাণিজ্য চলেছিল। সে পথে নিউবিয়া ও সুদানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সেখান থেকে আসত হাতীর দাঁত, সোনা ও বনজ সম্পদ। ব্যবসায়ীরা ধনী হলেও সমাজে তাদের কিন্তু অন্যান্য দেশের মত তেমন মর্যাদা ছিল না। মিশরের এটা একটা বৈশিষ্ট্য বলতে হবে।

ধর্মমত—অতি প্রাচীন যুগে মিশরে নানা উপজাতি এসে বাস করত। তখন থেকে সেই সব জাতির মধ্যে দেবতার প্রতীক হিসেবে প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ প্রাণী থাকত। সামান্য কীটপতঙ্গ থেকে বড় আকারের ষাঁড় পর্যন্ত পবিত্র প্রাণী বলে তারা পূজো পেত। মিশরীয়রা এসব প্রাণীদের মারত না, খেত না, বরং ভক্তি করে সেবা করত। আমাদের দেশেও এরূপ বিশ্বাস আছে যে ষাঁড় মহাদেবের বাহন, ইঁদুর গণেশের বাহন, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা। মিশরীয়দের আদি দেবতার নাম **'রা'**, আর থীবস্ অঞ্চলের লোকদের আদি দেবতার নাম **'আমোন'**। মিশরের সাম্রাজ্য যখন থীবস্ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন আদি দেবতার মিলিত নাম হয় 'আমোন-রা'। কার্নাকের মন্দিরে খুব ঘটা করে এর পূজো দেওয়া হত। কিন্তু ফ্যারাও আমোন-হোতেপের সময় সে পূজো বন্ধ হল। এমন কি তার চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। তাঁর আদেশে মিশরের নতুন দেবতা হলেন 'আতোন' বা সূর্য। ফ্যারাও আমোনহোতেপ তখন থেকে নিজের নাম করলেন **ইখনাতোন** (অর্থাৎ রবিতোষ)। তাঁর

ফ্যারাও চতুর্থ—ইখনাতোন

মতে সূর্যদেব সকল জীবের দেবতা, তাঁর পূজায় আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, তিনি নিষ্ঠুর নন, দয়ালু। ধর্মের ক্ষেত্রে সূর্যপূজার প্রভাব ব্যাপক। কিন্তু প্রাচীন মিশরের ধর্মবিশ্বাসে জন্তু জানোয়ারের প্রভাব কম নয়। জলহস্তিনী দেবতা এর বিশেষ দৃষ্টান্ত।

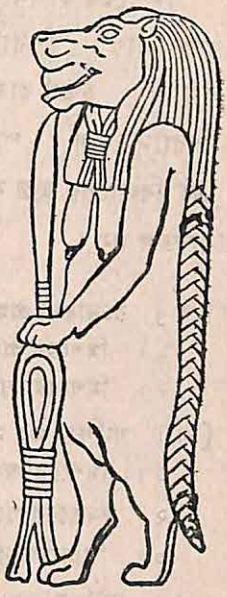

জলহস্তিনী দেবতা

পিরামিড—মিশরের মমির কথা তোমাদেরকে বলেছি। এবারে পিরামিডের কথা বলব। ফ্যারাওদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করে তার ওপরে পাথরের স্মৃতিমন্দির তৈরি করা হত। তারই নাম পিরামিড। সমাধির ভেতর অনেক মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী রাখা হত।

মিশরের আদিযুগের ইতিহাসকে লোকে পিরামিড যুগ বলে। ফ্যারাও খেটমিটার থেকে তাঁদের বংশের উদ্যোগে পর পর প্রায় সত্তরটি পিরামিড তৈরি হয়। ফ্যারাওরা মৃত্যুর আগেই কবর তৈরি করে যেতেন। এই পিরামিডগুলো ভারিভারি পাথর দিয়ে তৈরি হত। ফ্যারাও

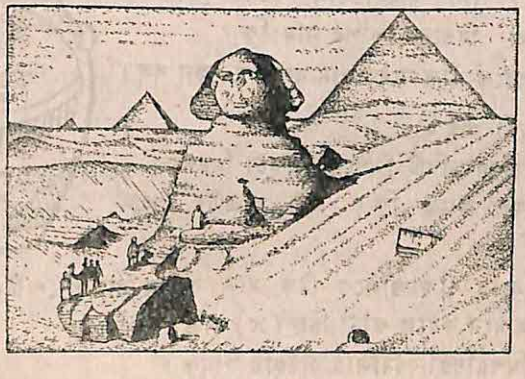

মিশরের পিরামিড

খুফু যে পিরামিড গড়েছিলেন, তা সবচেয়ে বড়। বিশ লাখ পাথর দিয়ে তৈরি। প্রতি পাথরের গড় ওজন ৫০ মণ। এই পিরামিডটি

উঁচুতে ৪৫০ ফুট। অবাক লাগে অত উঁচুতে কি সুন্দর জোড়া লাগান।

মিশরের রাজধানী কায়রোর কাছে আজও চল্লিশটি পিরামিড দেখা যায়। পিরামিড পৃথিবীর আশ্চর্য। কিন্তু এই প্রথা স্থায়ী হয় নি। চতুর্থ রাজবংশ পর্যন্ত এর জাঁকজমক ছিল। সেই পর্যন্তই পিরামিড যুগ। পরে ফ্যারাওদের অবস্থা খারাপ হয়। ব্যয়বহুল এই বিলাসের জন্য সামর্থ্য বা উৎসাহ আর থাকে না। ফলে প্রথা বাতিল হয়।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় দাও।

২। মিশরের ফ্যারাওদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মিশরের অবদান ও ভূপ্রকৃতির পরিচয় দাও।

২। মিশরের পুরোহিতরা কি করতেন?

৩। পিরামিড কাকে বলে? পিরামিড সম্বন্ধে কি জান?

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) মিশরের আদি বাসিন্দা কারা? (খ) সবচেয়ে বড় পিরামিড কে তৈরি করেন? (গ) ইখনাতোন কিসের পূজা চালু করেন? (ঘ) মিশরের লিপির নাম কি?

২। মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন বল।

[ঘ] বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। পাশের ছবিটি মিশরের একটা নিদর্শন। এর গায়ে নকশা আছে কি? এই পাত্রটির এক রেখাচিত্র আঁক।

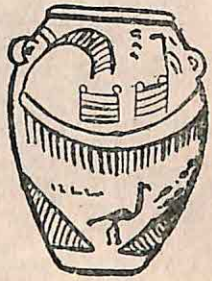

২। নিচের বাক্যগুলিকে ঠিক মনে করলে তার পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও, বা ভুল মনে করলে কাটা চিহ্ন (×) দাও।

(ক) মিশরীয়রা বর্ণমালার ব্যবহার জানত।

(খ) মিশরে দাসপ্রথা ছিল না।

(গ) হিক্‌শসদের কাছ থেকে মিশরীয়রা ঘোড়ার ব্যবহার শেখে।

———

(গ) সিন্ধুসভ্যতা

মহেন-জো-দরো ও হরপ্পা—মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মত ভারতবর্ষেও এক প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সে বেশ পুরোনো দিনের কথা। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সেই অঞ্চলের নাম **মহেন-জো-দরো**। স্থানটি সিন্ধুদেশের লারকানা জেলায়, এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। এটি করাচি থেকে তিন শ' কুড়ি কিলোমিটার দূরে। পাঞ্জাবের পথে ছয় শ' চল্লিশ কিলোমিটার উত্তরে পশ্চিমপাঞ্জাবের মণ্টোগোমারি

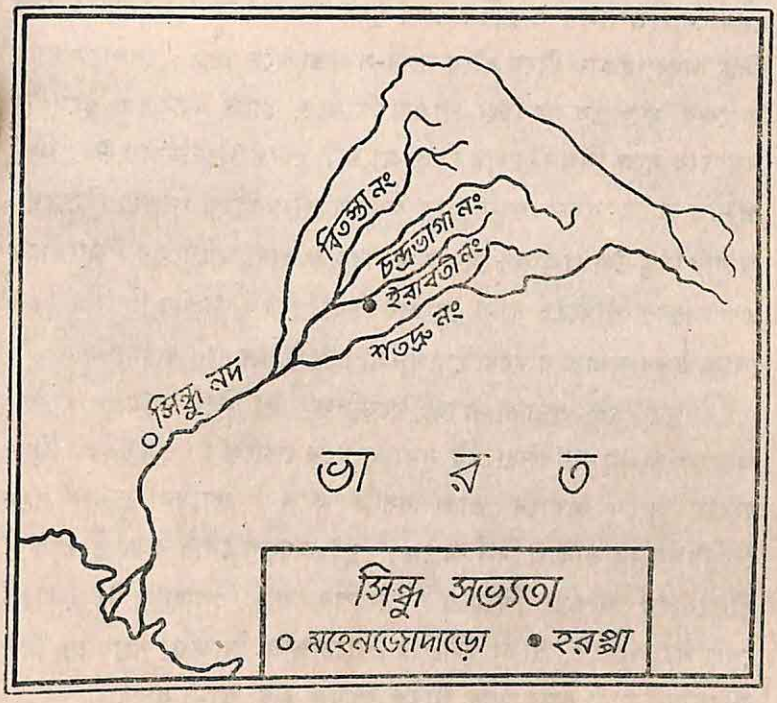

জেলায় আর এক অঞ্চলের নাম **হরপ্পা**। এই দুই স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে পৃথিবীর আর এক প্রাচীন নগর-সভ্যতার সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পাকা ঘরবাড়ি, বিচিত্র বাসনপত্র, সীলমোহর, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, তামা ও ব্রঞ্জের অলঙ্কার, দেবদেবীর মূর্তি—এমন কত কি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। দুই অঞ্চলের ভগ্নস্তূপ থেকে

আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলোর বেশ মিল দেখা যায়। সম্প্রতি রাজস্থান ও গুজরাটেও এই ধরনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এককালে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে মিল থাকায় সাধারণভাবে এই সভ্যতাকে সিন্ধুসভ্যতা নামে চিহ্নিত করা হয়।

সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চল ছিল নদীবহুল। বর্ষার পলিমাটি স্থান দুটিকে উর্বর করে তুলেছিল। চাষবাসের কাজে ওই অঞ্চল ছিল খুবই উপযুক্ত। তাই মনে হয় আশপাশ থেকে অনেকেই ওখানে এসে বাস করত। সেখানে পশুপালন ও কৃষিকাজের খুবই সুবিধে ছিল। কালক্রমে সেই সিন্ধু অববাহিকায় ধীরে ধীরে নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে। সেখানে খনন কাজের ফলে যে সব চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তাতে মনে হয় সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার মিল আছে। মেসোপটেমিয়ার উর, কিস প্রভৃতি স্থানে মহেন-জো-দরোর অনুরূপ সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। আবার সিন্ধু-উপত্যকায় সুমের অঞ্চলের মত সাদা মার্বেলের সীলমোহর এবং অন্যান্য পাথরের নানা খোদাই করা পাত্রও পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে উভয় সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগ ছিল অনুমান করা হয়।

সিন্ধুর এই সভ্যতা কারা গড়েছিল—তা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন দ্রাবিড়রা এই সভ্যতা গড়ে তোলে। ভারতের দক্ষিণে যাবার আগে এখানে তারা বসতি করে। তাদের ভাষার সঙ্গে বেলুচিস্থানের ভাষার মিল আছে। দুই অঞ্চলে মোট প্রায় দু হাজার সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। বেশির ভাগ পোড়ামাটির তৈরি। সেগুলির ওপরে আঁকা লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। কোনদিন সেটা সম্ভব হলে আরও অনেক কথা জানা যাবে।

নগর পরিকল্পনা—কালক্রমে সিন্ধুসভ্যতার যে খুবই উন্নতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। মহেন-জো-দরোর ধ্বংসস্তূপে সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি সবই নগর-সভ্যতার স্তর। সম্ভবত বন্যার ফলে বার বার নগরটির ধ্বংস হয়। পরে আবার নগর গড়ে ওঠে। তখনকার নগর পরিকল্পনা সত্যই খুব সুন্দর ও উচ্চমানের ছিল। রাস্তাগুলি ছিল

সোজা ও চওড়া। দুধারে সারি সারি পাকা বাড়িঘর—এমন কি কোথাও তিন তলা পর্যন্ত উঁচু। রোদে-পোড়া ইটে বাড়িগুলো তৈরি হত। জানালা দরজা খুব বেশিই থাকত। তাতে প্রচুর আলো-বাতাসের সুবিধে ছিল। প্রতি বাড়িতে কুয়ো ও স্নানের ঘর থাকত। মহেন-জো-দরোর বড় স্নানঘরের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তাতে মনে হয় সাঁতার কাটবার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। তার সঙ্গে ছিল জলে নামবার সিঁড়ি, স্নানের পর

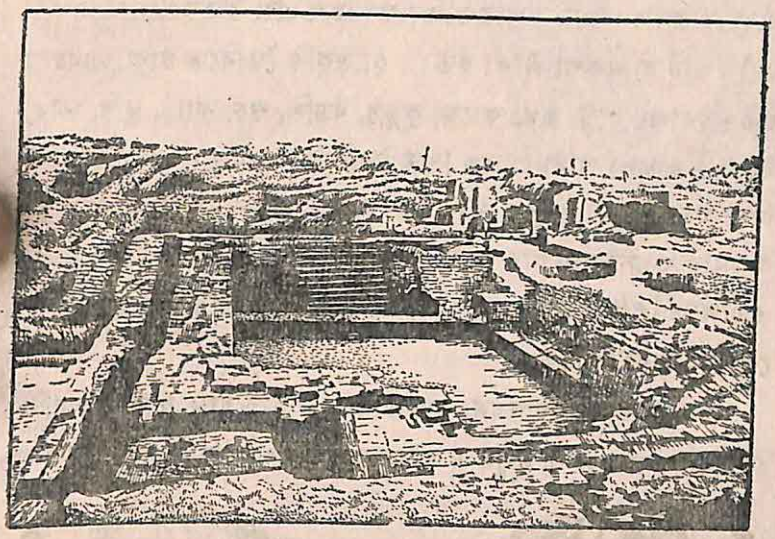

মহেন-জো-দরোর স্নানাগার

পোষাক বদলানোর ঘর। জল নিকাশের ও নালানর্দমার সুবন্দোবস্ত ছিল। আবর্জনা ফেলার জন্য রাজপথে স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এ ছাড়া বড় বড় হলঘর ছিল। প্রায় বাড়িতেই আঙিনার ব্যবস্থা ছিল। হরপ্পাতেও আবিষ্কৃত হয়েছে বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ। সেখানকার শস্য মজুত করার ঘরটি উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুসভ্যতায় নগর নির্মাণের কৌশল বেশ স্বাস্থ্যসম্মত ছিল। এতে সৌন্দর্যবোধেরও পরিচয় মেলে। নগরের একটা বিশেষ অংশ উঁচুস্তরে গড়া হত—সেখানে থাকত সাধারণের জন্য হলঘর, পূজোর স্থান ও কারখানা ইত্যাদি। নীচু অংশের নগরে বাস করত সাধারণ লোক।

জীবনযাত্রার রীতিনীতি—সিন্ধু এবং হরপ্পার লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল যব ও গম। খেজুর ও অন্যান্য ফলও তারা খেত। দুধ ও দুধের তৈরি খাবার তাদের ছিল প্রিয় খাদ্য। এরা শাকসব্জি ও মাছ-মাংসও খেত। রান্নার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে পৃথক রান্নাঘর ছিল।

দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পাকা মাটির, চীনা মাটির এবং তামা ও ব্রঞ্জের ও পাথরের বাসনপত্র ছিল। ধনী লোকেরা রূপোর বাসনও ব্যবহার করত। মাটির পাত্রগুলি মসৃণ ছিল এবং কতকগুলোর ওপরে রঙীন ছবি বা নকশা আঁকা হত। হাঁড়িকুড়ি তৈরিতে চাক ব্যবহার হত। থালা, বাটি, জগ, কাস্তে, কুড়ুল, বঁড়শি, সূচ, কাঁচি, ছুরি, তীর, ধনুক—এগুলো তামা বা ব্রঞ্জ দিয়ে তৈরি হত বেশি। মোষের শিং দিয়ে গড়া চিরুনী, পুতুল ও বিভিন্ন খেলনা-পত্র, নানা পাথর ও ধাতুর অলঙ্কার ও সোনারূপোর গহনা—এমন কত সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে শিল্প ও রুচিবোধের পরিচয় আছে। তখনকার যুগে অবশ্য লোহার ব্যবহার ছিল না।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই তখন অলঙ্কার পরত—হার, বাজু, বালা ও আংটি। মেয়েরা পায়ে মল বা নূপুর ও কানে ঝুমকো ব্যবহার করত। হাড় বা

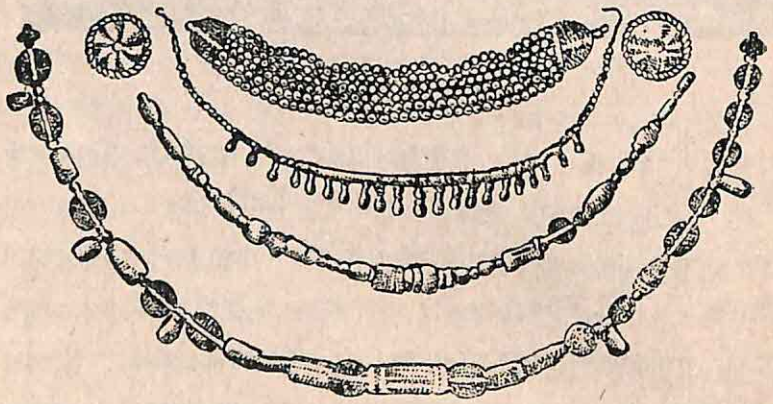

সোনারূপার অলঙ্কার

হাতীর দাঁতের গহনার কারুকার্য খুবই সুন্দর। তখন সেখানে তুলোর কাপড় বুনে পরবার রীতি ছিল। শীতকালে পরা হত পশমের তৈরি

পোষাক। তাঁতীরা মাটির তৈরি মাকু ব্যবহার করত। ব্রঞ্জের তৈরি একটা মেয়ের নাচের মূর্ত্তি দেখে অনুমান করা হয় যে তখন মেয়েদের মধ্যেও নাচগানের ব্যবস্থা ছিল। মেয়েরা সাজ-পোষাক ভালবাসত ও শৌখিন প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করত। মহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় সমাধি, দেব-দেবীর মূর্তি ও ভগ্নদুর্গের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সীলমোহরের গায়ে পশু-পাখীর মূর্তি ও চিত্রধর্মী লিপি রয়েছে। এসব তৈরির জন্য শিল্পী যথেষ্ট ছিল মনে হয়। ওজনের জন্য দাঁড়িপাল্লা ও পাথরের বাটখারা ছিল।

ব্রঞ্জের মূর্তি

পুতুল

উপজীবিকা, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য—সিন্ধুসভ্যতায় সাধারণ লোকেদের চাষবাস ও পশুপালন ছিল উপজীবিকা। নানা ধরনের জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখে মনে হয় তারা গরু, ভেড়া, উট, মোষ, ছাগল প্রভৃতি পুষত। কাঠ, মাটি, পাথর ও ধাতুর শিল্পকাজে অনেক কারিগর ছিল। কুমোর, তাঁতী, ছুতোর, স্যাকরা, ব্যবসায়ী—এমন সব বিভিন্ন পেশার লোক ছিল। এশিয়ার ও আফ্রিকার নানা স্থানে বণিকরা ব্যবসা করত। জলপথ ও স্থলপথ—এই দুই পথেই তাদের ছিল ব্যবসা। সীলমোহরে স্পষ্ট কয়েকটি নৌকোর ছবি দেখা যায়। উট গাধা ছিল স্থলপথের বাহন। তখন ঘোড়ার ব্যবহার তারা জানত না। বলদে টানা চাকার গাড়ীর চলন ছিল। কেনাবেচা, কারিগরি, শিল্প কর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য—প্রধানত এগুলিই ছিল সিন্ধু ও হরপ্পার অর্থ-নৈতিক জীবনের ভিত্তি। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে ক্রমে নগরজীবন গড়ে ওঠে।

ধর্মজীবন—আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় তখনকার সিন্ধুবাসীরা কি

পূজো করত, ধর্মবিশ্বাসই বা তাদের কেমন ছিল। সীলমোহরের ছবি, মাদুলিও পোড়ামাটিরস্ত্রীমূর্তি দেখে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেন সিন্ধুর অধিবাসীরা মাতৃতন্ত্রের উপাসক ছিল। অবশ্য পুরুষ-দেবতার মধ্যে শিবের স্থান ছিল। ত্রিশূলধারী পশুপতি দেবের মূর্তি শিবমূর্তি বলেই মনে হয়। সেই মূর্তিতে রয়েছে তিন মুণ্ড। জন্তু-

সীলমোহর

পশুপতি

জানোয়ার, সাপ, গাছ এবং পাথরেরও তারা পূজো করত। সেকালে ধর্মের সঙ্গে পরলোকের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর মানুষ নতুন জীবন শুরু করে। তাই বেশির ভাগ মৃতদেহকে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হত। সেই সঙ্গে সমাধিপাত্রে কখন কখন জীবজন্তুরহাড় ও নানা অলঙ্কারপত্র রাখা হত। কখন কখন মৃতদেহকে খোলা জায়গায় রাখা হত—পশুপাখী তা খেয়ে ফেলত। আবার আগুনে পুড়িয়ে ফেলে দেহের ছাইটুকু সমাধিপাত্রে রাখার নিয়মও ছিল।

সভ্যতার উৎকর্ষ—প্রাচীন সিন্ধু অঞ্চলের নিদর্শনগুলি সেকালের এক উন্নত সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়। সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে সমাজে বহু শ্রেণীর মানুষ ছিল। তবে জাতিভেদ ছিল কিনা জানা যায় না। বড়লোকেরা দুই বা তিন তলার বাড়ীতে বাস করত। গ্রাম অপেক্ষা নগরের গুরুত্ব ছিল। গরীবদের বাড়ি ছিল আয়তনে ছোট। কৃষকরা শহরের বাহিরে গ্রামে বাস করত। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের বৈচিত্র্য বেশ উচ্চমানের সভ্যতার পরিচয় দেয়। সম্ভবত দাসপ্রথা

ছিল না। তবে মনে হয় গরীবেরা ধনীর অধীনে শ্রমের কাজ করত।

সিন্ধুসভ্যতা বার বার নষ্ট হয়। আবার সেখানে সভ্যতা গড়ে ওঠে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা যে সেই সব ধ্বংসের একটা বড় কারণ, তা মনে হয়। কেউ কেউ মনে করেন আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে শেষবারের মত তার ধ্বংস হয়। যাই হোক—নদীর জলের পলিমাটিতে প্রাচীন ভারতে গড়ে ওঠা এই নগরসভ্যতার কীর্ত্তিচিহ্ন কালক্রমে মাটির তলায় তলিয়ে যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার জন মার্শাল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সব অঞ্চলে খনন কাজ চালান। তারই ফলে আমরা আজ প্রাচীন ভারতের এই সভ্যতার কথা জানতে পেরেছি।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। সিন্ধুসভ্যতা বলতে কি বোঝ ?

২। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাচীনকালে নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল ?

৩। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনগুলির পরিচয় দাও।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সিন্ধুবাসীর সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কি জান ?

২। সিন্ধুবাসীরা কিসের উপাসক ছিলেন ?

৩। সিন্ধুসভ্যতায় ব্যবসা-বাণিজ্যর অবস্থা কেমন ছিল ?

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। সিন্ধু সভ্যতা প্রথম কে আবিষ্কার করেন ?

২। সিন্ধু ও হরপ্পা অঞ্চলের সীলমোহরগুলি কেমন ?

৩। সিন্ধু-উপত্যকার লোকদের খাদ্যসামগ্রী কি ছিল ?

[ঘ] বস্তুমুখী প্রশ্ন :

৪। উক্তিগুলি ঠিক কিনা বল : (ক) মহেন-জো-দরোতে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল না। (খ) হরপ্পা মন্টগোমারির নিকটবর্তী। (গ) সিন্ধুবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত না।

———

(ঘ) চীন

অবস্থান—চীন দেশে বেশ প্রাচীনকালেই সভ্যতার পত্তন হয়। হোয়াংহো ও ইয়াং-সিকিয়াং—এই দুই নদীর তীরে সেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু তার আদিযুগ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সে বিষয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে। বলা হয় প্যান-কু নামে এক অসাধারণ মানুষ স্বর্গ, মর্ত্য, পাহাড়-পর্বত ও নদনদী সৃষ্টি করেন। তাঁর শরীরের জীবাণু থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন চীনের কথা—রূপকথার মত চীনদেশের অনেক কাহিনী আছে। তা থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে পাঁচজন আদর্শ রাজা ছিলেন। তাঁরাই চীনের লোককে নানা বিষয়ে সভ্য করে তোলেন। ঘরবাড়ি তৈরি করা, ছবি আঁকা, গানবাজনা ও চাষ-আবাদ করা, কাপড় তৈরি করা, রেশম শিল্পের কাজ, অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার, লেখাপড়া শেখা—এসব কাজ তাঁরাই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এসব গল্প বা কিংবদন্তী মাত্র।

সাঙ বাইনবংশের রাজত্বকাল থেকে চীনদেশ সম্বন্ধে কিছুটা সঠিক খবর পাওয়া যায়। এই রাজবংশ খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় আঠার শ' বছর থেকে বারো শ' বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। হোনান নামক স্থানে এই রাজবংশের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গিয়েছে। এটাকে 'ইনদের ঢিবি' বলা হত। এই স্তূপের মধ্য থেকে পুরাতাত্ত্বিক অনেক নিদর্শন বের হয়েছে—ব্রঞ্জের তৈরী বাসন ও অস্ত্রশস্ত্র সুন্দর সুন্দর চীনামাটির বাসন, জেড্-নির্মিত নানা দ্রব্য, রঙীন ও মিনে করা মাটির পাত্র, কাছিমের খোলের উপর আঁকা ছবি, হাতীর দাঁতের কাজ ইত্যাদি। এগুলি সে যুগের শিল্পের উৎকৃষ্ট চিহ্ন। কাছিমের উপর আঁকা ছবির সাহায্যে ভবিষ্যৎ গণনা করা হত—এ অদ্ভুত প্রথা ছিল।

চীনের সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্ট হয় **চৌবংশের** রাজাদের আমল থেকে। এদের প্রথম রাজার নাম উ-উয়াং। ইনি সাঙ বংশের শেষ রাজাকে হারিয়ে রাজা হন। ইনি অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণীর লোকদেরকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন। তাদেরকে বেশ কিছু জমি দেন। তারা

আবার সাধারণ লোককে অল্প কিছু করে জমি দেন। সেই সব লোকেরা জমিদারদের জন্য নানা কাজে নিযুক্ত থাকত।

চৌ-সম্রাটদের বেশ বশে ছিল উঁচু স্তরের মানুষেরা। তাদের নীচে থাকত বণিক ও শিল্পীরা। সৈনিকদেরও সমাজে মর্যাদা ছিল। সমাজে বৃহৎ পরিবারের সম্মান খুব বেশি ছিল। বুড়োবুড়ীর স্থান ছিল উচ্চে। ক্রীতদাসরা ছিল সমাজের শেষ ধাপে।

চীনের সম্রাটরা ছিলেন সর্বশক্তিমান। তাঁদের অধীনে বিশাল সৈন্য থাকত। সেকালে চীনাদেরকে শ'শ' বছর ধরে বর্বর হূন, তাতার ও মোঙ্গলদের সঙ্গে লড়াই করতে হত।

চীনাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। পরে তারা চা উৎপাদন করতে শেখে। তারা খাল কেটে নদী থেকে জল নিয়ে জমিতে সেচ দিত। চাল, গম, যব, ভুট্টা ছিল তাদের খাদ্য। হাঁস, মোরগ, ছাগল, ভেড়া ও ঘোড়া তারা পুষত এবং ঘোড়ার গাড়িও ব্যবহার করত।

পশমি কাপড় তারা তৈরি করত। উটের পিঠে করে তারা গ্রীস ও রোমে রেশমি কাপড় নিয়ে বেচত। কাঠের আসবাবপত্র পালিশ করতেও তারা ছিল দক্ষ।

চীনের লিপি ও বিদ্যাচর্চা—চীন দেশে অতি প্রাচীনকালেই লোকে লিখতে শেখে। চীনা লিপিতে ছবির প্রাধান্য ছিল। পরে ছবির বদলে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হত। 'উজ্জ্বল' এই কথা বোঝাতে সূর্য ও চন্দ্রের ছবি আঁকা হত। চীনা বর্ণমালায় প্রায় আশি হাজার প্রতীক চিহ্ন আছে। অন্তত চার হাজার চিহ্ন না জানলে চীন ভাষা শেখা যায় না। লেখার সময় চীনারা কলমের বদলে তুলি ব্যবহার করত। চীনাদের কৃতিত্বের মধ্যে কাগজ তৈরি ও ছাপার কাজের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তারা গাছের ছাল ও পুরানো কাপড়ের মণ্ড দিয়ে প্রথম কাগজ তৈরি শুরু করে। তার তিন শ' বছর পরে মুদ্রণ ব্যবস্থা আবিষ্কার করে।

চীনে জ্যোতিষ বিদ্যার চর্চা ছিল। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যৎ গণনা করতেন। তাঁরা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কথা জানতেন। তাঁরা ৩৬৫¼ দিনে

বছর গণনা করতেন। চীনাদের মধ্যে মৃত পিতৃপুরুষের নামে পূজোর বিশেষ প্রথা ছিল।

নদীর বন্যা সম্বন্ধে গল্প—নদী-উপত্যকায় চীনের সভ্যতা গড়ে ওঠে। নৌকা তৈরিতে চীনারা পটু ছিল। ইয়াং-সিকিয়াং ও হোয়াং-হো ছিল সবচেয়ে বড় নদী। হোয়াং-হোকে বলা হত চীনের দুঃখ। প্রতি বছর এই নদী বন্যার জলে কূল ভাসিয়ে দিত। হোয়াং-হোর বন্যা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অনেক আজগুবি গল্প আছে। বলা হত এই নদীটি যে অঞ্চলের মানুষের ওপর রেগে যেত, তাদেরকে সব ডুবিয়ে মারত। সেই কারণে লোকে তাকে জীবন্ত দেবতা মনে করতে। সেই নদী-দেবতাকে খুশি করার জন্য কত পূজো তারা করত। চীনারা বন্যা আটকাবার জন্য শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলধারার নিয়ন্ত্রণ করে। পোড়ামাটির ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধ তৈরি করে তারা বন্যার জল আটকাতে শেখে। আবার বাঁধের জল খাল কেটে নিয়ে গিয়ে তাই দিয়ে সেচের ব্যবস্থাও তারা করে। এ ছিল তাদের বড় কৃতিত্ব।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। চীনের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান বল।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। চীনের লিপি ও বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। নদীর বন্যা সম্বন্ধে চীনাদের কি বিশ্বাস ছিল।

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। সাঙ বংশের রাজত্বকাল কি ?

২। চৌ-বংশের প্রথম রাজার নাম কি ?

৩। চীনাদের বিশেষ একটি আবিষ্কারের নাম কি ?

———

(ঙ) নদী-উপত্যকায় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

পাঁচ ছয় হাজার বছর আগেকার কয়েকটি পুরানো সভ্যতার কথা তোমরা শুনলে। সেগুলি সবই নদী-উপত্যকায় গড়ে ওঠে। ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস—এই দুই নদীর মাঝখানে মেসোপটেমিয়া। মিশরকে তো লোকে বলে নীলনদের দান। সিন্ধু অববাহিকায় হয়েছিল সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ। চীনের যে প্রাচীন সভ্যতা, সেও তো নদীর তীরেই গড়ে ওঠে।

কৃষিকাজ—এই সব নদীনির্ভর প্রাচীন সভ্যতার চরিত্রের দিক দিয়ে বেশ একটা মিল আছে। বর্ষার সময় নদীর জল দুই তীর ছাপিয়ে ওঠে। ফলে জমা হয় পলিমাটি। পলিমাটিতে জমি উর্বর হয়। অল্প আয়াসেই মানুষ সেখানে চাষ করে ফসল ফলাতে পারে। তাই আশপাশের মানুষেরা একের পর এক ওই সব অঞ্চলে জড় হয়। খাদ্য উৎপাদনের সুযোগসুবিধেই তাদেরকে টেনে আনে নদী-উপত্যকায়। মানুষ যেদিন খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান ছেড়ে দিয়ে খাদ্য উৎপাদনে মন দিয়েছে, সেদিন থেকে তাদের জীবনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন হল। কারণ তার আগে তারা বনেজঙ্গলে বা পাহাড়পর্বতে শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে খাদ্যের সন্ধানে। তখন বেশিদিন এক জায়গায় তারা থাকতে পারে নি। বনের ফলমূল তো আর অফুরন্ত নয়। আর মানুষের উৎপাতে বনের পশুর সংখ্যাও কমতে বাধ্য। কাজেই তখন মানুষ বাধ্য হয়েই ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে। সে অবস্থায় তারা ছিল প্রায় আধা-বর্বর পর্যায়ে।

স্থায়ী বসতির পরিবেশ—কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে মানুষ একদিন নদী-তীরে এসে হাজির হল। নদীর তীর সে দেখল ভিজেমাটিতে বীজ ফেললে ফসল হয়। তাই সেখানে সে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল। ফলের গাছও পুঁততে লাগল। গাছ বাড়াতে গেলে জল দরকার। নদীর জলে সে অভাব তার মিটল। সেখানে পলিজমা মাটিতে চাষবাসে প্রচুর শস্য তারা পেল। তাদের খাবার সংস্থান হল। তারা পশুপালনও করত। তাদের সঙ্গে গরুমোষ যা ছিল, তাদের খাবার ও জল মিলল। তারা

তখন চাষের জন্য নদীতীরেই ঘর বাঁধল। নদী-উপত্যকার আবহাওয়াও ছিল চাষের ও বাসের উপযোগী—না গরম, না ঠাণ্ডা। নদী-উপত্যকার পরিবেশ মানুষকে স্থায়ী বাসের নানা সুযোগ এনে দিল। ক্রমে নগরসভ্যতার আবির্ভাব হল। কারণ খাবারের সংস্থান হতেই মানুষ জীবনযাত্রার অন্যান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতে লাগল। অবসর পেল মানসিক শক্তির বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিতে। তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, নূতন নূতন সম্ভাবনা দেখা দিল। ফলে নানা দেশে নদীর তীরের মাটিতেই প্রাচীন সভ্যতার আলো প্রথম ছড়িয়ে পড়ে।

মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীন—এইসব দেশে নদী-উপত্যকার অঞ্চলগুলি প্রায় কাছাকাছি সময়ে নানা ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এসব স্থানের আবহাওয়া ও পরিবেশ সভ্যতা সৃষ্টির অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিল। তবে নদী-উপত্যকা থাকলেই সেই পরিবেশে সর্বত্র যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তা নয়। সভ্যতা সৃষ্টির জন্য একদল মানুষের বুদ্ধি, শ্রম ও আগ্রহ চাই। এই সবের অভাব ছিল বলে কঙ্গোনদী বা মিসিসিপি ও আমাজোন নদের তীরে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন—নদনদীনির্ভর প্রাচীন সভ্যতার অঞ্চলগুলির একটা বিশেষ চরিত্র ছিল। কৃষিকাজ সেখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। প্রায় সর্বত্র ধান গম যব—এই সব খাদ্যশস্যেরই চাষ বেশি হত। তাদের চাষবাস ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। সামাজিক জীবনের অবস্থাও অনেকখানি কৃষির উপর নির্ভর করত। কৃষিপরিবারে এক সঙ্গে থাকবার প্রয়োজন ছিল। কারণ বহু লোকের সহযোগিতা ছাড়া কৃষিকাজ চলে না। এই প্রয়োজনে যৌথ পরিবার ও গ্রাম গড়ে ওঠে। চাষ ও ফসল রক্ষার জন্য স্থায়ী বসতি হয়। ভাল বসতি গড়ার প্রয়োজনে বাসগৃহের ক্রমোন্নতি হয়। কাপড়চোপড়, বাসনপত্র ও সাজসরঞ্জাম—এসব উপকরণ দিন দিন বাড়তে থাকে। ক্রমে নানা ধরনের কারিগরি পেশার আবির্ভাব ঘটে। নানা পেশায়

লোকে নিযুক্ত হয়। দোকানদার, জমির মালিক ও শ্রমিক—এমন কত বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠে। উদ্বৃত্ত শস্য ও বাড়তি শিল্পসামগ্রী কাজে লাগাবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি হয়। কারণ নদীপথে বহির্বাণিজ্যের সুযোগ সহজেই কার্যকর হয়। নৌকাতে ভারি ভারি মালপত্র বোঝাই করে দেশবিদেশে অল্প খরচেই নিয়ে যাওয়া চলে। বিদেশ থেকেও মালপত্র স্বদেশে আনা যায়। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার নদী-নির্ভর সভ্যতার আর একটা বৈশিষ্ট্য। মনে হয় তখনকার সমসাময়িক সভ্য দেশগুলির মধ্যে জলপথে ব্যবসার যোগ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সেই সব দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি হতে থাকে। বিত্তশালী লোকেরা ক্রমে পাকা ঘরবাড়ি তৈরি করে। এই ভাবে ধীরে ধীরে নদী-উপত্যকা অঞ্চলের কোন কোন অংশে বড় শহর গড়ে ওঠে। শাসকরা নগর শাসন করতে থাকে এবং তাদের সাহায্য করবার জন্য কর্মচারীরাও ছিল।

খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা মেটবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব দেশের লোকেরা অন্য চিন্তাতে মন দিয়েছিল। কেন বিদ্যুৎ চমকায়, বৃষ্টি কেন হয়, বাজ কেন ডাকে, ভূমিক্ষয় কেন হয়, মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়—এই সব কথা তারা ভাবতে থাকে। তা থেকে মানুষ ধর্ম ও বিজ্ঞানের সূচনা করে। অবশ্য সব উত্তর তারা খুঁজে না পেয়ে অনেক আজগুবি চিন্তাও করেছে, এবং কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়েছে। দেবদেবী সম্বন্ধে তারা নানা রকমের কল্পনা করেছে। জীবজন্তু ও গাছপালার ওপরেও সেই চিন্তার প্রভাব পড়েছিল। দেব-দেবীর মূর্তিতে কোথাও কোথাও পশুর চেহারার অংশবিশেষ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

সেযুগে মনের ভাব প্রকাশের জন্য লিপি আবিষ্কারের কোন না কোন পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে লিপি ছিল চিত্রধর্মী, পরে প্রতীকরূপে অক্ষর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই প্রাচীন সভ্যতার লিপিগুলি আজ পর্যন্ত সব পড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। তা পড়তে পারলে অনেক অজানা কথা জানা যাবে। সেদিন কি মজাই না হবে!

নদীনির্ভর প্রাচীন সভ্যতায় তামা বা ব্রঞ্জের ব্যবহার দেখা যায়। সেই সব ধাতুর ব্যবহারে শিল্পোন্নতি হয়েছিল। মাটি ও পাথরের জিনিস-পত্রের ওপরে নানা কারুকার্যের নিদর্শনে শিল্পের যথেষ্ট পরিচয় আছে সন্দেহ নাই। তবে সে যুগে লোহার প্রচলন হয় নি।

নদীনির্ভর সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল আকাশের গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে জ্যোতিষ বিদ্যার চর্চা। নদীর ওপর চাঁদের প্রভাব তারা লক্ষ্য করেছিল। কারণ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে নদীতে জোয়ার ভাঁটা হত। তারা বিশ্বাস করত যে গ্রহনক্ষত্র মানুষের ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সেকালের নদী-নির্ভর সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মাত্র গুটিকতক তথ্য এখানে তুলে ধরা হল।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। নদীনির্ভর সভ্যতায় কৃষিকাজের স্থান কি ?

২। নদীনির্ভর সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। নদীর তীরে ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে গড়ে ওঠে ?

২। নদী-উপত্যকার সভ্যতায় অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল ?

[গ] বস্তুধর্মী প্রশ্ন :

১। ডানদিকের বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক শব্দ কোন্‌টি তা স্থির করে তাই দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) কৃষির যুগে পরিবারের লোক—(একসঙ্গে/আলাদাভাবে) বাস করত।

(খ) পুরোহিতশ্রেণীর প্রভাব প্রাচীন সভ্যতায় (কম/বেশি)—ছিল।

(গ) তখন জলপথে ব্যবসাবাণিজ্য—(কঠিন / সহজ) ছিল।

(ঘ) নদী-উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতার সময়—(লোহার/ব্রঞ্জের) ব্যবহার ছিল না।

———

অধ্যায়

৫

॥ লৌহযুগের সমাজ ॥

লোহার আবিষ্কার—তামা ও ব্রঞ্জযুগের কথা আমরা বলেছি। এবার লোহার আবিষ্কারের কথা বলব। তামা ও ব্রঞ্জ উচু দাম দিয়ে কিনতে হত। এদের উপাদানও সুলভ ছিল না। কালে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির সমস্যা দেখা দেয়। অবশ্য প্রাচীন মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় মাটিতে লোহার চুর থাকলেও তেমন কোন ফল হয়নি। কারণ লোহা তৈরির কৌশল তখন অজানা ছিল। দু' হাজার বছর খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্মেনিয়া পাহাড়ে কিজুয়াদানা অঞ্চলে এক বর্বরজাতির বাস ছিল। তারাই ঐ সময় প্রথম লোহা তৈরির কৌশল আবিষ্কার করে। তখন আর্যদের এক শাখা মিত্তানির শাসকেরা তাদের সৈন্যদলে লোহার সেই মিস্ত্রীদেরকে রেখে দেয়। রাজারা লোহা তৈরির ব্যবসা ও গোপনীয়তা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখে। পরে মিত্তানিদের হারিয়ে হিটাইতরা যখন ক্ষমতা দখল করে, তখন তারাও ঐরূপ গোপনীয়তা রক্ষা করে। হিটাইতের রাজা মিশরের তৃতীয়এমিনোফিসকে মূল্যবান উপহার হিসেবে লোহা দিতে চায়, তবে তৈরির কৌশল জানায় নি। কিন্তু পরে সেই সৈন্যদের মধ্য থেকে অর্থলোভী কারিগররা লোহা তৈরির কৌশল বাইরে জানিয়ে দেয়। ক্রমে নানা দেশে লোহার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে পড়ে। লৌহ আবিষ্কার এক নতুন যুগের সূচনা করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন—লোহার আবিষ্কার মানুষের ইতিহাসে এক প্রবল ও ব্যাপক শক্তির জোগান দেয়। সাধারণ জন-সমাজ ও বর্বর জাতিরাও সস্তায় প্রয়োজনমত মজবুত লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি পেতে থাকে। তারা স্বনির্ভর হতে শেখে। শিল্পে, বাণিজ্যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ব্যাপারে লৌহযুগে অনেক পরিবর্তন ঘটে। লোহার মারণাস্ত্রে বর্বররাও সভ্যদেশ আক্রমণ করে। রাজারাও দিগ্বিজয়ে বের হয়। লোহার ব্যবহারে সভ্যতাবিকাশের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দুইই বাড়ে। সমাজজীবনে শ্রেণী বিভাগ ও জটিলতাও বেড়ে যায়। ক্রমশ কারিগরি শিক্ষার বিচিত্রতা এবং বিজ্ঞানেরও উন্নতি হতে থাকে।

রাজতন্ত্রের উদ্ভব—নদীর উপত্যকায় লোকে ঘরবাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বাস করত। লোহার জিনিসপত্রে চাষ-আবাদের আরও সুবিধে হল। লাঙ্গল, কাস্তে, হাতুড়ি, কোদাল সব লোহায় তৈরি হল। কৃষকদের কৃষি অঞ্চলে বা তাদের গ্রামের উপর মাঝে মাঝে হঠাৎ শত্রুরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। ধনসম্পদ লুঠ করাই ছিল ওদের প্রধান কাজ। অবশ্য জায়গা দখল করে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও তারা ছাড়ত না। ওই সব শত্রুদের আটকাবার জন্য একদল লোক লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। তারা সৈনিক নামে পরিচিত হল। কিন্তু তাদের চালাবে কে? তার জন্য তাদের সর্দার বা অধিপতি ছিলেন রাজা। প্রজাদের রক্ষা করা ছিল তাঁর কাজ। রাজ্য প্রথমে যত ছোটই হক, একা রাজ্য চালান যায় না। তাই রাজাকে সাহায্য করত উঁচুস্তরের লোকেরা। পাহাড়-পর্বতে বা উঁচু জায়গায় দুর্গ নির্মাণ করে রাজারা রাজধানীতে বাস করতেন। দুর্গের দরজাও লোহা দিয়ে তৈরি হত। দুর্গ জয় করা শত্রুদের পক্ষে বেশ কঠিন কাজ ছিল। দেশের মধ্যে চুরি ডাকাতি বন্ধ করা, সমাজের শাসনব্যবস্থা ঠিক রাখা ও বিচার করা—এই সবও ছিল রাজার কাজ। প্রথম প্রথম যোগ্য লোকই রাজা হত। পরে অবশ্য রাজপদ বংশানুক্রমে চলত। রাজ্য চালাবার জন্য রাজকোষে অর্থ চাই। তাই রাজারা কর আদায় করতেন। যুদ্ধজয়ের ফলে রাজ্যের সীমাও বাড়তে থাকে। এই ভাবে ক্রমশ রাজতন্ত্র শক্তিমান হয়ে ওঠে। লৌহযুগে এই ভাবে রাজশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। লোহা আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন ঘটে।

২। লৌহযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা লেখ।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। লোহার অস্ত্রের সুবিধে কি?

২। রাজপদ গড়ে ওঠে কেমন করে।

[গ] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। লোহা দিয়ে কি কি অস্ত্র ও উপকরণ তৈরি হত?

২। রাজারা কোথায় বাস করতেন?

———

এক (ক) ব্যাবিলন

সূচনা—মেসোপটেমিয়া ও মিশরে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার মূলে ছিল নদী-উপত্যকার পরিবেশ। মিশর দেশ বাইরে থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল। কারণ পশ্চিমে মরুভূমি ও বালিয়াড়ি, পূর্বে মরুভূমি ও লোহিতসাগর ও দক্ষিণে দুর্ভেদ্য জঙ্গল এবং নিগ্রোদের বাস। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার অবস্থা ছিল অন্যরকম। অতটা বিচ্ছিন্ন ছিল না। এখানে প্রথমে আসে **সুমেরীয়রা**। তারা খাল কেটে, জলাভূমির জল সরিয়ে বাঁধ বেঁধে ও ব্যবসা করে এখানকার অনেক উন্নতি করে। রোদে পোড়া ইটে পাকাবাড়ি বানাত। এসব কথা আমরা আগে বলেছি।

এই সুমেরীয়দের রাষ্ট্রগুলিতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ হলেও বেশ কিছুকাল তাদের স্বাধীনতা বজায় ছিল। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সেমিটিক জাতের লোকেরা বাস করত। তারা আক্কাদ নামক স্থানে রাজ্য পত্তন করে। সুমেরীয়দের সঙ্গে তারা ব্যবসা করত ও মাঝেমাঝে সংঘর্ষও চালাত। **সারগন** নামে এক নেতা তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেন। তিনি সুমের অঞ্চল দখল করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের নাম হয় সুমের-আক্কাদীয়। এরা অবশ্য সুমেরীয়দেরকে জয় করলেও তাদের লিপি, ভাষা ও **সভ্যতার** অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল। এদের নিজেদের সভ্যতা উচ্চমানের ছিল না। যাই হোক, এইভাবে প্রায় ছয়শ' বছর কাটে।

ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবি—সেমিটিক জাতের আরএক শাখা আমোরাইট নামে পরিচিত। কালক্রমে তারা আক্কাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করে। তারা প্রথমে সিরিয়া থেকে এসে নদীর তীরে **ব্যাবিলনের** ছোট শহরে বসতি করে। সেই নগররাজ্যের শক্তিশালী যোদ্ধা রাজা ছিলেন **হামুরাবি**। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ২১০০ অব্দে সুমের এবং আক্কাদ দুইই জয় করেন। সমস্ত মেসোপটেমিয়া তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন হয়। হামুরাবি শক্ত এক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে

রাজশক্তি বৃদ্ধি পায়। পাথরে খোদাই করা তাঁর আইনের সঙ্কলন ও সরকারি চিঠিপত্র ব্যাবিলনের উন্নত শাসনব্যবস্থা ও উচ্চ সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। আইনের চোখে সবাই সমান—হামুরাবির এই আদর্শটি উল্লেখ-যোগ্য। আজ পর্যন্তও সভ্য দেশে এই নিয়মটিই অনুসরণ করা হয়। তিনি সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। স্ত্রীলোকের অধিকার, সম্পত্তির বণ্টনব্যবস্থা, বিবাহের রীতি, শিল্পীদের মজুরি, চোরের সাজা, দাসপ্রথার নিয়ম—এ সব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল।

হামুরাবি

আসিরীয় সাম্রাজ্য—এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মেসোপটেমিয়া যখন পর্যন্ত ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের অধীনে আসেনি, তার আগে ব্যাবিলনের উত্তরে তাইগ্রিসের তীরে আর এক সেমিটিক জাতের লোক বাস করত। তারা আসুর বা আসিরীয় নামে পরিচিত ছিল। এই আসিরীয়রা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে খুবই উন্নতি করে। এদের আসুর নামে এক নগর ছিল এবং রাজধানী ছিল **নিনেভে**। এরা ঘোড়া ও নানাবিধ সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করত। আর্মেনিয়া দখল করে এরা লোহার খনি পায়। তারা খুব নির্মম, দুর্ধর্ষ ও অত্যাচারী ছিল। এদের রাজা দ্বিতীয় সারগন ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লোহার মারণাস্ত্র নিয়ে দারুণ যুদ্ধ করে। এরা ঢেঁকির মত ভারী যন্ত্র তৈরি করে তাই দিয়ে দুর্গ ভেঙ্গে ফেলত। এরা মেসোপটেমিয়া ও মিশরে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ব্যাবিলনের উপরও কর্তৃত্ব করে। আসিরীয়দের সেন্নাচেরিভ নামে এক রাজা ৬৯১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ব্যাবিলনের নগরদেবতা **বেলমারডুক** দখল করে নিজের রাজ্যে তা নিয়ে যান। তাঁর পুত্র **অসুরবানিপাল** অবশ্য সেই নগর-দেবতাটিকে ব্যাবিলনে ফিরিয়ে আনেন। তাদের মধ্যে অসুরবানি-পালই ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তিনি সুমের ও ব্যাবিলনের অনেক লিপি

ও পোড়ামাটির ফলকে লেখা বইপত্র নিনেভের গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করেছিলেন। সে সব এখন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

ক্যাল্ডীয়দের অধীনে ব্যাবিলন—আসিরীয়দের অসম্ভব উন্নতি দেখে পারসিক ও মিডিরা আসিরীয়দের সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য ক্যাল্ডীয়দের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা ৬০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিনেভে ধ্বংস করে। ব্যাবিলনের রাষ্ট্রটিও ক্যাল্ডীয়দের অধিকারে আসে। বেশ কিছু কাল ধরে নিনেভে এবং ব্যাবিলন—এই দুই নগরের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল বলতে হয়। যাই হোক, ক্যাল্ডীয়রা ব্যাবিলন দখল করে। সেখানে ক্যাল্ডীয়দের রাজা দ্বিতীয় **নেবুকদ্‌নেজার** পুনরায় ব্যাবিলনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য টিকে ছিল। কিন্তু পারসিক সম্রাট সাইরাসের কাছে ব্যাবিলনের সেই সাম্রাজ্যের পতন হয়।

নেবুকদ্‌নেজার—দ্বিতীয় নেবুকদ্‌নেজার ব্যাবিলনের আর এক শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে ব্যাবিলন নগরটি শোভা ও সমৃদ্ধিতে ছিল অতুলনীয়। নগরটি ছিল ইউফ্রেতিস নদীর দুই তীরে বিস্তৃত। তাঁর তৈরি এক সুন্দর সেতু নগরটির দুই অংশের সংযোগ বজায় রাখত। নগরটিকে ঘিরে ছিল প্রাচীর ও প্রাচীর ঘিরে ছিল পরিখা। নগরে প্রবেশের আটটি বড় বড় দরজা ছিল। **ইস্তার-দেবীর** নামাঙ্কিত দরজাটি ছিল প্রধান। সেই দরজার পাশে ছিল উচ্চ মিনার। মিনা করা ইঁটের ওপর ছিল সিংহ, ষাঁড় ও ড্রাগনের চিত্র! নগরটির মাঝখানে ছিল **মারডুকের** মন্দির, তার উল্টো দিকে ছিল সাততলার উঁচু জিগ্‌গুরাট। সম্রাটের প্রাসাদ ছিল বিস্তৃত ও মনোরম। খিলানের শক্ত গাঁথুনি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রাসাদে থামের ওপর মাচা তৈরি করে তার ওপরে কৃত্রিম পাহাড় ও ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি হয়। ঝুলন্ত উদ্যানটি খুবই সুন্দর ও পৃথিবীর এক আশ্চর্য বস্তু। ব্যাবিলনের স্থাপত্যশিল্প খুবই প্রশংসনীয়। বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির, তোরণ ও উদ্যান নগরটির কতই না শোভা বৃদ্ধি করত।

ধর্মবিশ্বাস ও পুরোহিত সম্প্রদায়—প্রাচীন ব্যাবিলনের অনেক

কথাই ভালভাবে জানা যায় নি। তবে মাটি খুঁড়ে পোড়ামাটির ফলকে লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। তাতে জলপ্লাবনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সুমেরীয় ভাষায় লেখা সে কাব্যের নাম 'গিলগমীশ' কাব্য। এই কাব্য থেকে জানা যায়—দেবতারা এঁদের কাছে ছিল মানুষের মত দয়ালু ও দরদী। ব্যাবিলনের সমাজে নগরদেবতার বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। রাজা বা পুরোহিত—এঁরা ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। নগরদেবতা ছিল রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। বিদেশীয়রা কখন কখন এই দেবতাকে অপহরণ করত। তাতে রাজ্যের পরাজয় হয়েছে মনে করা হত। এই ধর্মবিশ্বাসের ফলে পুরোহিতদের ক্ষমতা খুবই বেশি হয়ে পড়ে। কারণ দেবতার পূজো ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান ব্যাপারে তাঁরাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। ব্যাবিলনের পুরোহিত সম্প্রদায় গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা চাঁদের তিথি হিসেবে মাস গণনা করতেন। তাই তাঁদের মতে বছর হত ৩৫৪ দিনে। তাঁরা গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে তফাত ধরতে পেরেছিলেন। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কবে হবে—একথা তাঁরা আগে থেকেই গুণে বলতে পারতেন। তাঁরা গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে ভবিষ্যৎ গণনা করতেন। জ্যোতিষীদের সমাজে ও রাজদরবারে বেশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

পুরোহিতরাই জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত থাকতেন। রাজারা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ে পুরোহিত শ্রেণীর উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। তবে ক্রমে দেখা যায় রাজারা অন্য দেশ জয় করে সেখানকার পুরোহিতদের কাছ থেকেও তাঁরা বেশ কিছু জ্ঞান লাভ করেন। ফলে কখনও কখনও দেশের পুরোহিত সম্প্রদায়ের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে রাজাদের সম্ভ্রমবোধ কিছুটা কমে যেত। তবে ব্যাবিলনে যাঁরা রাজপদে বসেছেন, তাঁরা যেদেশ থেকেই আসুন না কেন, তাঁদের রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা নগরদেবতার স্বীকৃতির উপরই নির্ভর করত। পুরোহিতরা সেই সব রাজাকে 'বেল-মারডুক' দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করলে, তবেই তাঁরা রাজার মত প্রতিষ্ঠা

পেতেন। এই প্রথা ব্যাবিলনে খুবই প্রবল হয়ে ওঠে। ব্যাবিলনের কোন কোন রাজা তাঁদের পোষাকে বেল-মারডুকের প্রতীক পরতেন। ক্যাল্ডীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ রাজা নেবুনিদস ব্যাবিলনের নগরদেবতার মন্দিরে স্থানীয় অন্যান্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। এতে নগরদেবতার অমর্যাদা হয়। ফলে পুরোহিত সম্প্রদায় বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। পারস্য সম্রাট সাইরাস যখন ব্যাবিলন আক্রমণ করেন, তখন প্রধান মন্দিরের পুরোহিতরা বিনা যুদ্ধেই সাইরাসকে বরণ করে নেন। সাইরাস ব্যাবিলনে পারস্যসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনিও কিন্তু বেল-মারডুকের আশীর্বাদ নিয়েই তা করেন। এই সব ঘটনাই প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ব্যাবিলনে নগরদেবতা ও পুরোহিতদের প্রভাব রাষ্ট্রশক্তির ওপর খুবই শক্তিশালী ছিল।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাবিলনের সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান ?

২। ব্যাবিলনে পুরোহিতদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। আসিরীয়দের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। হামুরাবি কে ছিলেন ? তিনি কি কি কাজ করেছিলেন ?

২। টীকা লেখ ঃ—অসুরবানিপাল, বেল-মারডুক, নিনেভে, নেবুনিদাস।

৩। দ্বিতীয় নেবুকদ্‌নেজার কে ছিলেন, তিনি কেন বিখ্যাত ?

[গ] বস্তুধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) হামুরাবির আইন — লেখা হয়। (খ) নিনেভেতে — ছিল। (গ) ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করেন —। (ঘ) ব্যাবিলনের জ্যোতিষীরা — দিনে বছর গণনা করতেন।

২। কথাটি ঠিক হলে পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও, বেঠিক হলে কাটা (×) চিহ্ন দাও।

(ক) সিরিয়া থেকে আর্যজাতি এসে ব্যাবিলন শহর স্থাপন করে।

(খ) কালে ব্যাবিলনে ক্যাল্ডীয়রা রাজত্ব স্থাপন করে।

(গ) নিনেভে মেসোপটেমিয়ার রাজধানী ছিল।

(ঘ) ব্যাবিলনে পুরোহিতরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করত।

(খ) মিশরের সাম্রাজ্যবিস্তার

সূচনা—আমরা প্রাচীন মিশরের ইতিহাসের কথা বলেছি। এবার লৌহযুগের সাম্রাজ্যবাদী মিশরের কথা বলব। মিশরের প্রাচীন রাজ্যব্যবস্থা বেশ দীর্ঘকাল বাইরের প্রভাব এড়িয়ে বর্তমান ছিল। অবশ্য অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন মিশরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের রাজারা প্রথমে পৃথক পৃথক ছিলেন। ক্রমে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হন। চতুর্থ রাজবংশের সময় সেটা ঘটে। তখন থেকে পঞ্চদশ রাজবংশের সময় পর্যন্ত একভাবে রাজত্ব চলেছে। তবে বিভিন্ন রাজধানী বা নানা রাজত্বের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ কিছু যে না হত, তা নয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৮৮ অব্দে হিক্‌শস নামে এক দুর্ধর্ষ জাত পশ্চিম এশিয়া থেকে মিশরে আসে। তারা ঘোড়ায় চড়ে এবং লোহার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মিশর আক্রমণ করে। মিশরের লোকেরা এর আগে ঘোড়া দেখেনি, তারা তখন তামা বা ব্রঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। লোহার অস্ত্রের কাছে তাদের অস্ত্রগুলি খুব দুর্বল ছিল। ফলে হিক্‌শসরা সহজেই মিশর জয় করল। হিক্‌শসরা ষোড়শ রাজবংশ হিসেবে মিশরে রাজত্ব শুরু করে।

হিক্‌শসরা প্রায় দুশ' বছর রাজত্ব করেছিল। এদেরকে অবশ্য মিশরের ইহুদীরা তখন সাহায্য করে। কিন্তু মিশরের দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে হিক্‌শসদের তাড়িয়ে দেয়। তারা এর মধ্যে লোহার অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছিল। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হিক্‌শসরা মিশর ছাড়তে বাধ্য হয়। এর পরে মিশরের খুবই উন্নতি হয়। তারা সৈন্যবলে প্রবল হয়। তারা তখন থেকে ইউফ্রেতিস নদীর তীর ধরে অন্যের রাজ্য জয় করতে শুরু করে। এই যুদ্ধে তৃতীয় থুথ্‌মেস ও তৃতীয় এমিনোফিস (অষ্টাদশ রাজবংশ) ইথিওপিয়া থেকে ইউফ্রেতিস অঞ্চল পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্য জয় করে সেই সব স্থানে তাঁদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মিশরের ইতিহাসে এঁদের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তখন মিশর হল সাম্রাজ্য। তাঁরা সুদক্ষ শাসক

ছিলেন। ব্যাবিলন, আসিরীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজাদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ের নমুনা থেকে তাঁদের সেই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মিশরে বিদেশ থেকে এসে যাঁরা রাজা বা সম্রাট হতেন, মিশরের পুরানো নিয়মে তাঁরাও রাজবংশের সংখ্যাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতেন। সিরিয়া থেকে বিদেশীয়রা এসে মিশরের কিছু অংশ দখল করে। তাদের রাজা দ্বিতীয় রামশেস মিশরের রাজবংশের উনিশের সংখ্যায় পড়ে। ইনি ১২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব অবধি ৭০ বছর রাজত্ব করেন।

মিশরের ফ্যারাওরা একের পর এক দিগ্বিজয়ে বের হতেন। এঁদের সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী লোহার অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চেপে ফিলিস্তান, ফিনিসিয়া এবং সিরিয়ার নগরগুলি দখল করে। নানা দেশে তাঁদের উপনিবেশ গঠিত হয়।

তৃতীয় এমিনোফিস ও তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় হিটাইত জাতির রাজা মূল্যবান উপহার হিসেবে তাঁকে লোহা দিতে চেয়েছিলেন। কালে সেই হিটাইতের সঙ্গে মিশরীয়দের যুদ্ধ চলে। এ ছাড়া বিলনীয়, আসিরীয় ও মিত্তানি প্রভৃতির সঙ্গেও তাদের যুদ্ধ হয়। মিশরের কাদাপেটা লিপি থেকে জানা যায় যে নানা দেশের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের নানা সময়ে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল। মিশরের ফ্যারাওরা বংশানুক্রমে পরপর রাজ্য জয় করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে সোমালি, সিরিয়া, ব্যাবিলন, আসিরীয় ও লাইবিয়া এগুলি মিশর রাজ্যের অধীনে উপনিবেশ হয়ে পড়ে। এই ভাবে মিশরের সাম্রাজ্য কালে বিশাল আকার ধারণ করে।

তখনকার দিনে রাজ্য জয় করার অর্থ ছিল ধনসম্পদ লুঠ করা, পরাজিত মানুষদের দাসে পরিণত করা। তাই দেশজয়ের ফলে যুদ্ধে পাওয়া প্রভূত ধনসম্পদ ও অগণিত বন্দী দাসদাসী মিশরে আসে। এতে মিশরে আর্থিক এবং সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়। বিনা বেতনে দাসশ্রমে গড়ে ওঠে রাস্তাঘাট, প্রাসাদ, মন্দির ও নগর। ফ্যারাওরা এবং অন্য উঁচুস্তরের লোকজনেরা বহু

টাকা-পয়সা ও অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে ভোগবিলাসে জীবন কাটাত। উঁচুস্তরের লোকেরাই সরকারী কাজে নিযুক্ত হত।

পুরোহিতের প্রভাব—সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জমি দেবতার নামে রাখা হত। পুরোহিতরা হতেন ঐ সব জমির মালিক। তাঁদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। তাঁদের সামাজিক মর্যাদাও যথেষ্ট ছিল। দরিদ্র মূর্খ মানুষরা তাঁদেরকে ভয়ে ভয়ে ভক্তি করত। তবে মিশরে ফ্যারাওরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি না মনে করে একেবারে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অবতার মনে করতেন। ফলে ফ্যারাওদের ক্ষমতা পুরোহিতদের চাইতে বেশি ছিল, তারা যেন ঈশ্বরের পুত্র বা বংশধর। এই কারণে মিশরের ফ্যারাওরা নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যেই বিয়ের সম্বন্ধ করতেন।

দেবতাদের সন্তুষ্ট করার নামে পুরোহিতরা অনেক মন্ত্র পড়তেন ও তুক্‌তাক করতেন। এই পুরোহিতরা অবশ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা করতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁরা অনেক কিছু জানতেন। গণিতের এক পুঁথিও মিশরে পাওয়া গিয়েছে। পুরোহিতরা উচ্চ দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তবে তাঁরা বলতেন যে প্রাণ অমর। মৃত্যুতে মাত্র দেহেরই বিনাশ হয়। তাঁদের মতে ভাল কাজ করলে মৃত্যুর পর ভাল ফল পাওয়া যাবে, মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল হবে। এই সব মত প্রচারের ফলে সাধারণ লোক শান্ত হয়ে থাকত। রাজা ও উঁচুস্তরের লোকেরা পুরোহিতদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। পুরোহিতদের কথায় পাপের ভয়ে প্রজারা শান্ত হয়ে থাকত। ফলে, রাজ-অনুগ্রহে পুরোহিতদের কর দিতে হত না।

সাধারণ মানুষের অবস্থা—রাজ্যজয়ের ফলে অন্যান্য দেশে মিশরের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা তাতে বিশেষ ভাল হয়নি। কৃষকদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। নীল নদের দুধারে ভাল করে বাঁধ বাঁধতে হত। খাল ও অন্যান্য জলাশয়-

গুলিতে নদীর ও বৃষ্টির জল তারাই ধরে রাখত। সেই জলে সারা বছর জমিতে সেচ করা হত। কৃষকদের জীবন অবশ্য সহজ ও সরল ছিল।

যুদ্ধজয়ের ফলে বিদেশ থেকে মিশরে বিনা মজুরির দাসদাসী অনেক আসে। তারা একমুঠো খাবারের বদলে জমি চাষ ও অন্যান্য অনেক কাজ করে দিত। ধনীরা তাদের দিয়ে শ্রমের কাজকর্ম ও চাষবাস করাত। দরিদ্র কৃষকরা দাসশ্রমের বিনা মজুরির লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। উৎপাদনের খরচ কমার ফসলের দাম কমে যায়। কৃষকরা তখন অভাবের দায়ে অল্প দামে তাদের জমিজমা বিক্রি করতে বাধ্য হত। ফলে মিশরের সাধারণ কৃষক ও মজুরের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। কিন্তু মিশরের সাম্রাজ্যবাদে রাজা ও তাঁদের অনুগত অভিজাত শ্রেণীর সুখসুবিধা অবশ্য বেড়েই যায় এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। জলপথেও বাণিজ্যপোতগুলি যাতায়াত করত। ফ্যারাওরা বহুকাল মিশরে রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে পট পরিবর্তন হল। আসিরীয়, পারসিক, গ্রীক, রোমান এরা সব পর পর মিশর দখল করে। পরে দখল করে আরবীয় মুসলমানরা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফল কি হয়েছিল লেখ।

২। মিশরের পুরোহিতদের অবস্থা বর্ণনা কর।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মিশরের সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে কি জান ?

২। মিশরের পুরোহিতরা কি করতেন ?

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। কি কি দেশের উপর মিশরের অধিকার বিস্তৃত হয় ?

২। পুরোহিতরা কি সুবিধে ভোগ করতেন ?

৩। কারা রাজকর্মচারী হত ?

———

(গ) ইরান

প্রাচীন পারস্যের এক নাম ইরান। আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে বের হয়ে নানা দলে বিভক্ত হয়। তাদের এক শাখা ইরানে, আর এক শাখা ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এ সব ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে। প্রাচীন ইরানী ভাষা আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত।

পারস্যের উন্নতি—আর্যদের দলে **মিডি** নামে এক পারসিক জাতির শাখা ছিল। তারা খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মিডিরা আসিরীয় দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তাদের সাম্রাজ্যের ক্ষতি করে। আসিরীয়দের প্রধান নগর নিনেভে তারা ধ্বংস করে। পরে কিছুদিন ধরে মিডিদের সঙ্গে পারসিকদের কলহ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে পারস্য সম্রাট **সাইরাস** মিডিদের দেশ দখল করে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তিনি লিডিয়া জয় করেন। সাইরাস পরে বাহ্লিক ও শক দখল করেন। ব্যাবিলনের পুরোহিতরা বিনা যুদ্ধেই সম্রাট সাইরাসকে বরণ করে নেয়। ইহুদীদের দেশও সাইরাসের অধীন হয়। সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কামবাইসিস রাজা হন। তাঁর বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি মিশরও জয় করেন। তারপর তাঁর মন্ত্রীর পুত্র দারায়ুস বা **দেরিয়াস** সম্রাট হন। তাঁর সাম্রাজ্য খুবই বিস্তৃত হয়। এর আগে এত বড় সাম্রাজ্য আর হয় নি। রাশিয়ার ভল্গা নদী পর্যন্ত এবং ভারতে রাজপুতানা অবধি পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

দেরিয়াসের অধীন পারস্য সাম্রাজ্য একত্রিশটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়। প্রতি অঞ্চলে একজন করে সেনাপতি শাসন কাজ চালাতেন। দেরিয়াসের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। তিনি নিজের নামে সোনারূপার মুদ্রা প্রচলন করেন। বাহিস্থানের খাড়া পাহাড়ের গায়ে তাঁর এক শিলালেখ দেখা যায়। তার মধ্যে দেরিয়াসের বিশাল মূর্তি খোদাই করা আছে। সেই মূর্তির সামনে রয়েছে পিঠমোড়া বন্দীর দল। উপরে পারস্যের দেবতা অহুর-মাজদা। দেরিয়াস কিন্তু গ্রীস জয় করতে গিয়ে গ্রীসের এক রাজ্য এথেন্সের কাছে পরাজিত হন। মারাথনে প্রচণ্ড এক যুদ্ধ হয়, তাতে এথেন্স বিজয়ী হয়। একজন লোক ২৬

মাইল পথ দৌড়ে গিয়ে সেই জয়ের খবর পৌঁছে দেয়। কিন্তু সেই পরিশ্রমে সে সঙ্গেসঙ্গেই মারা যায়। লোকে কথায় বলে 'মারাথন রেস'। দেরিয়াসের পরে সম্রাট হন তাঁর পুত্র জারেক্‌সিস। জারেক্‌সিস তাঁর পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এথেন্স পুড়িয়ে দেন। তিনি বীর স্পার্টান সৈন্যদেরকে থার্মপলির যুদ্ধে হারিয়ে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীকদের সঙ্গে জলযুদ্ধে তিনি হেরে যান। তখন থেকে গ্রীক-দের মধ্যে এথেন্সে আবার নূতন উৎসাহ জাগে। এর পরেও দু'শ' বছর পারস্যসাম্রাজ্য টিকে ছিল। কিন্তু ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে পারস্য জয় করেন। তখন থেকে পারস্যসাম্রাজ্যের গৌরব লুপ্ত হয়।

ধর্মবিশ্বাস—ইরানীরা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করত। তাদের প্রধান দেবতা অহুর-মাজ্‌দা। দেরিয়াস ও অন্যান্য সম্রাটরা তাঁর উপাসক ছিলেন। ইরানীদের মধ্যে এক মহাপুরুষ জন্ম নেন। তাঁর নাম জরথুস্ট্র। তিনি নূতন এক ধর্মের প্রচারক ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে গৌতম বুদ্ধের বা চীনের কনফিউশিয়াসের সমসাময়িক মনে করেন। জরথুস্ট্রকে অগ্নির অবতার বলা হত।

ইরানীরা সূর্যকে অহুর-মাজ্‌দা বলত। অহুর-মাজ্‌দা আমাদের দেশের বৈদিক ইন্দ্র বা সূর্যদেবতা। অহুর-মাজ্‌দা আবার অগ্নি নামেও পরিচিত ছিলেন। অগ্নির আর এক নাম ত্বষ্টা বা ত্বষ্ট্রি, তিনি বিরাট, অজর ও অমর। ইরানীদের মতে জরথুস্ট্র অগ্নিদেবতার অবতার হিসাবে তাদের ধর্মপুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁর এই ধর্মপুস্তকের নাম **জেন্দ-আবেস্তা**। তাতে ধর্মবিষয়ক স্তোত্র ও গাথাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল। জরথুস্ট্রের মতে পৃথিবীতে সৎ ও অসৎ এই দুই শক্তি আছে। একটি হল আলোর রাজ্য, অন্যটি অন্ধকারের। অহুর-মাজ্‌দা আলোর দেবতা, আর অন্ধকারের দেবতা অহ্রিমন। অহুর-মাজ্‌দা জ্ঞান ও সত্যের দেবতা, আর অহ্রিমন পাপের এবং অজ্ঞানের দেবতা। মানুষের মনের মধ্যেও এই দুই দেবতার দ্বন্দ্ব চলে।

সেকালে ধর্মের নামে অনেক ক্রিয়াকলাপ করা হত। ফলে, পুরোহিতদের প্রাধান্য বাড়ে। কিন্তু মূর্তিপূজার কোন রীতি ছিল না। আবেস্তার ভাষার সঙ্গে আমাদের দেশের বেদের ভাষার আশ্চর্য মিল আছে। আবেস্তা ছাড়াও ইরানে বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। তাতে জানা যায় প্রাচীন ইরানের সভ্যতা কত উন্নত ছিল। ইরানের প্রাচীন ভাষা পহ্লবী ভাষা নামে পরিচিত। ইরানের রাজসভায় আড়ম্বর ও বিলাসিতা খুব বেশি ছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পেও প্রাচীন ইরানে যথেষ্ট উন্নতি হয়। অবশ্য সে সব শিল্পের ওপর আসিরীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আলেকজাণ্ডারের ইরান আক্রমণের ফলে বহু শিল্পচিহ্ন বিধ্বস্ত হয়।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১ প্রাচীন ইরান সাম্রাজ্য কিভাবে গড়ে ওঠে ?

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। রাজা দেরিয়াস সম্বন্ধে কি জান ?

২। ইরানের ধর্মমত আলোচনা কর।

[গ] বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে ইরান — করেছিল।

(খ) ইরানে — পূজার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

(গ) ইরানের প্রাচীন ভাষা — ভাষা নামে পরিচিত।

(ঘ) ইরানীরা সূর্যকে — মনে করত।

[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। জরথুস্ট্র কাকে বলে ?

২। জরথুস্ট্র কি বই রচনা করেন ?

———

(ঘ) ইহুদীদের কথা

পরিচয়—ইহুদীরা হীব্রু নামে পরিচিত ছিল। এরা খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে ইউফ্রেতিস নদীর মোহনায় বাস করত। এরা এককালে ফিনিসীয়দের প্রতিবেশী ছিল। ইহুদীরা ছিল মরু অঞ্চলের বাসিন্দা। উগ্র প্রকৃতির সঙ্গে তাদের লড়াই করে বাঁচতে হত। এশিয়ার নানা অঞ্চলে তারা ঘুরে বেড়াত। জীবনযাত্রা কঠিন ছিল বলেই তারা কোন বড় শহর বা রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু তারা অত্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল দেবতাই তাদের রক্ষক। তাদের কয়েকটি শাখা অবশেষে ফিলিস্তানে বসবাস করতে আসে। তখন ফিলিস্তানের অধিকাংশ লোক ছিল হিটাইত, তারা আর্যদের একটি শাখা। এই হিটাইতদের সঙ্গে ইহুদীরা মিশে যায়। সে ইতিহাস প্রায়ই অজানা। হঠাৎ ফিলিস্তানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন ইহুদীদের এক দল মিশরে এসে উপস্থিত হয়। তারা মেষপালন করত। তাদের দলপতি **জোসেফ** ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বিদেশী হিক্‌শসরা মিশর আক্রমণ করলে এরা তাদের সাহায্য করে। মিশরের রাজা জোসেফকে একটি প্রদেশের শাসনকাজে নিযুক্ত করেন। ইহুদীরা মিশরে হিক্‌শসদের কাছে অনেক কিছু শিখেছিল। মিশরীয়দের সংস্পর্শে এসে ইহুদীরা অনেক সভ্য হয়ে ওঠে। তাদের জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধও বদলায়।

মিশরীয়রা পরে হিক্‌শসদের তাড়িয়ে দেয়। তখন ইহুদীদের দুর্গতি দেখা দেয়। ইহুদীরা হিক্‌শসদের সহায়তা করেছিল বলে তাদেরকে ক্রীতদাস করা হয়। খাঁটি মিশরীয় নূতন ফ্যারাও ইহুদীদের উপর জোর অত্যাচার শুরু করেন। ইহুদীদের দিয়ে তিনি জোর করে রাস্তাঘাট ও পিরামিড তৈরি করিয়ে নেন।

ইহুদীদের মিশর ত্যাগ—এই সময়ে তাদের মধ্যে এক মহাপুরুষ জন্ম নেন। তাঁর নাম মোজেস। তিনি ইহুদীদের নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যান। কিন্তু ফ্যারাও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি তাদেরকে ধরবার জন্য সৈন্য পাঠান। ইহুদীরা লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছানর

সঙ্গেসঙ্গেই দেখে পিছনে অগণিত সৈন্য। মোজেস তখন নাকি তাঁর হাতের লাঠিটা জলের উপর ধরেন, আর সমুদ্র দুভাগ হয়ে মাঝখানে পথ করে দেয়। তারা সব নিরাপদে সেই পথ ধরে চলে যায়। সৈন্যরা যেই পিছনে ধাওয়া করে, মোজেস আবার লাঠিখানা জলের উপর তুলে ধরেন। সমুদ্রের জল তখন আবার এক হয়ে যায়। জলের মধ্যে সৈন্যরা সব ডুবে মারা যায়। অপর পারে আসার পর মোজেস সিনাই পাহাড়ে ঈশ্বরের দশটি আদেশ খোদাই করা দেখতে পান।

ইহুদীরা উদ্বাস্তু হয়ে চলে এল। কিন্তু কেউ সহজে তাদেরকে আর আশ্রয় দিতে চায় নি। মোজেস ইহুদীদের নিয়ে যুদ্ধ করেন। পরবর্তী নেতা যশুয়ার আমলে ইহুদীরা কানান দেশ দখল করেন। এই দেশ বর্তমান ইজরাইলের অংশবিশেষ। মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা ফ্যারাওয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। সেটি ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা।

কানান অঞ্চলে ইহুদীদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রীটদেশ থেকে-আসা ফিলিস্তানী লোকেরা অবশ্য মাঝেমাঝেই ইহুদীদের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করত। তবে **ডেভিড** যখন তাদের রাজা হন, তখন ইহুদীদের উন্নতি হয়। তিনি ফিলিস্তানীদের জেরুজালেম দুর্গ দখল করেন। তাঁর ছেলে সলোমনের রাজত্বকালে আরও উন্নতি হয়। তিনি খুব জ্ঞানী গুণী লোক ছিলেন। তাঁর সুবিচারের খ্যাতি গল্পের বস্তু হয়ে আছে। একদিন দুই স্ত্রীলোক একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে ঝগড়া করতে করতে তাঁর দরবারে হাজির হয়। দুজনেই বলে যে ছেলেটি তার। সলোমন বললেন—'বেশ, ছেলেটিকে কেটে দুভাগ করে তাদেরকে দেওয়া হবে।' একটি স্ত্রীলোক তাতেই রাজী হল। আর একজন কেঁদে বলল—'না না হুজুর, কাটবেন না, আমার ছেলের দরকার নেই।' সলোমান বুঝলেন ছেলেটি কার। তিনি সেই মহিলাটিকেই ছেলেটি দিয়ে দিলেন। তাঁর বিচারবুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল।

ধর্মমত—জেরুজালেমে ইহুদীদের মন্দির নির্মিত হয়। তাদের দেবতার নাম **জিহোবা**। মন্দিরে জিহোবার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীন জগতে

এদের ধর্ম ও নীতির আদর্শ উচ্চ ছিল সন্দেহ নাই। এরা কালে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। এদের ধর্মমত বাইবেলের 'ওলড টেস্টামেণ্টে' জানা যায়।

পরিণতি—সলোমনের আমলে ইহুদীরা নানা দেশে ব্যবসা করতে যেত। আকাবা উপসাগরে ইহুদীরা একটি বন্দর পায়। সলোমন বিদেশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ইহুদীরা একত্রিত হয়ে ইজরাইল রাজ্য গড়ে তোলে, রাজধানীর নাম হয় সামারিয়া। ওদের আর দুইটি শাখা জুডা রাজ্য গড়ে—রাজধানী জেরুজালেম। পরে নিজেদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় আসিরীয়রা সামারিয়া রাজধানী দখল করে। ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকুদ্‌নেজার জুডা দখল করেন। ব্যাবিলনীয়রা জুডা থেকে ইহুদীদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ব্যাবিলনে তাদের সংস্পর্শে ইহুদীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বাণিজ্যনীতিতে ক্রমশ উন্নত হয়। কিন্তু পরে ব্যাবিলন পারস্যের অধীনে যায়। তখন ইহুদীরা সেখান থেকে ফিরে গিয়ে জু (Jew) নামে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এদের ইজরাইল নামে পৃথক রাষ্ট্র হয়েছে।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। ইহুদীদের কথা কি জান বল।

২। ইহুদীরা কেন ও কিভাবে মিশর থেকে পালিয়ে যায়?

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মোজেস কে ছিলেন? তাঁর কীর্তিকাহিনী কি?

২। সলোমন কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান।

[গ] মৌখিক প্রশ্ন :

১। জেরুজালেমে কিসের মন্দির তৈরি হয়?

২। ইহুদীরা ব্যাবিলনে কেন যায়? ইহার ফল কি হয়েছিল?

———

দুই গ্রীসদেশের কথা

সাধারণ পরিচয়—গ্রীসদেশটি ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। দেশের ভিতর ছিল অনেক পাহাড়-পর্বত। এখানকার আদি বাসিন্দা ছিল অনার্য পেলাসগি ও ঈজিয়ান জাতি। ঈজিয়ান সাগরে বিশেষত ক্রীট দ্বীপে তারা গড়ে তোলে ঈজিয়ান সভ্যতা। বল্কান উপদ্বীপের

উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে আর্যদের এক শাখা এসে ওদের দেশ জয় করে নেয়। সেই বিজয়ী আর্যরাই কালে গ্রীক জাতি নামে পরিচিত হয়। এদের আসল নাম হেলেনী। তাদের ভাষাই হয় গ্রীসের ভাষা। অনার্য ঈজিয়ানদের সভ্যতা ক্রমে ধ্বংস হয়। তবে গ্রীক সভ্যতার ওপর সেই অনার্য সভ্যতার বেশ প্রভাব পড়েছিল।

ক্রীটদ্বীপ ও তার সভ্যতার প্রভাব—গ্রীসের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে ক্রীট দ্বীপ বর্তমান। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে ক্রীট দ্বীপে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। মিশর ও ব্যাবিলনের সভ্যতার মতই এর গৌরব। মাটি খুঁড়ে এই প্রাচীন সভ্যতার বহু চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ও তার

গায়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য, মূল্যবান আসবাবপত্র, বড় বড় নক্‌শা, রঙীন মাটির পাত্র, সীলমোহর ও শিল্পজাত জিনিসপত্র—এমন কত কি। ক্রীটের বাসিন্দারা মিশরে ও অন্যান্য নানা দেশে ব্যবসাবাণিজ্য করতে যেত। অন্য দেশের ধনসম্পদও তারা নিয়ে আসত। সাইপ্রাস দ্বীপের তামার খনি থেকে তামা তুলে এনে তাই দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরি করত। বিদেশে তারা সেই সব বিক্রী করত। প্রাসাদের গায়ে ক্রীটানরা ছবি আঁকত। সেই ছবিগুলো থেকে তাদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি জানা যায়। ওজন ও মুদ্রার ব্যবহার তারা জানত। তাদের নৌবাহিনী ছিল। তাদের সভ্যতা গ্রীসে প্রসারিত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশের প্রসার—এই বিষয়ে তাদের কাছ থেকেই গ্রীকদের মধ্যে প্রভাব সংক্রামিত হয়। মাটির পাটায় যা সব লেখা পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ পড়তে পারলে এই সভ্যতার আরও অনেক কথা মানুষ জানতে পারবে।

ক্রীটসভ্যতা কেন হঠাৎ ধ্বংস হয়েছিল সঠিক বলা যায় না। ভূমিকম্প বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণ হতে পারে। তবে অনেকে বলেন, গ্রীস থেকে আর্যদের একটি শাখার শাখা ক্রীট আক্রমণ করে। তারা সেখানকার রাজপ্রাসাদ আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে। সে প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কথা। প্রাসাদশিল্পে, দেওয়ালচিত্রে, সোনা-রূপা ও মাটির পাত্রের কারুকার্যে ক্রীটদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গ্রীকসভ্যতার উপর ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব আছে অনেকখানি।

হোমারের যুগ বা বীরযুগ—হোমার ছিলেন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ মহাকবি। তিনি ছিলেন অন্ধ চারণ কবি। তিনি ইলিয়াড ও ওডেসি নামে দুখানি মহাকাব্য লিখেছিলেন—সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে। বীরত্বের কাহিনীতে কাব্যদুটি পূর্ণ। আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারতের যেমন মর্যাদা, গ্রীসে তেমনি ইলিয়াড এবং ওডেসির মর্যাদা। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস স্পার্টার রাজার স্ত্রী হেলেনকে অপহরণ করে। তাই গ্রীকদেশের রাজারা যুদ্ধে ট্রয় ধ্বংস করে ইলিয়াড তারই বিবরণ। ট্রয়যুদ্ধের পর ওডেসিয়াস বা ইউলিসিস

সাগরপথে নানাস্থানে ভ্রমণ করে কষ্ট পান। তার কাহিনী ওডেসির বিষয়বস্তু। হোমারের যুগকে বীরযুগ বলা হয়। গ্রীকরা যেমন দেবতাদের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিত, তেমনি অনেকে ওই সব পৌরাণিক বীরদের থেকেই তাদের বংশের উৎপত্তি মনে করত।

রাজনীতির পরিচয়—হোমারের যুগে গ্রীস ছিল ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত। এদের মধ্যে তেমন রাজনৈতিক একতা ছিল না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্ট সমতল ভূমিতে এক একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সেযুগে রাজনীতিতে রাজাই ছিলেন আইনত সর্বেসর্বা। তিনি নিজেই হতেন প্রধান সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত এবং প্রধান বিচারক। রাজার এই প্রাধান্য হোমারের যুগের পরেও বহুদিন পর্যন্ত ছিল। লক্ষ্য করার বিষয় যে হোমারের যুগে দুটি সমিতি রাজার ক্ষমতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করত। তার মধ্যে একটি সমিতি ছিল অভিজাতদের, অন্যটি সাধারণ মানুষদের। অভিজাতদের সমিতির নাম ছিল 'বুলে' (Boule)। জনসাধারণের সমিতিকে বলা হত 'আগোরা' (Agora)। রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রজারা এই সমিতিতে যোগদান করার অধিকারী ছিল। রাজার ইচ্ছা অনুসারে সমিতির সভা বসত। 'বুলে-'র পরামর্শে রাজা সিদ্ধান্ত নিতেন এবং 'আগোরাতে' সে বিষয়ে জনসাধারণের অনুমোদন চাইতেন। উপস্থিত জনগণ সমবেতভাবে তাদের মত জানাত। কিন্তু আলোচনা করা বা নতুন কোন প্রস্তাব করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ফলে অভিজাতরাই বেশী মর্যাদা ভোগ করত। রাজা তাদের সাহায্য নিয়েই চলতেন। রাজপদ প্রায়ই উত্তরাধিকার সূত্রে চলত।

সমাজের পরিচয়—হোমারের যুগে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। সমাজে ব্যক্তি অপেক্ষা পরিবারের গুরুত্ব ছিল বেশি। ভিন্ন ভিন্ন জমির মালিক হত পরিবার, কোন ব্যক্তি নয়। পরিবারের লোক মারা গেলে পরিবারের নিজের জমিতেই মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হত। পরিবারে কর্তার ইচ্ছাই প্রাধান্য পেত। তিনিই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পরে অবশ্য তাঁর এ ক্ষমতা হ্রাস পায়। অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা রাজ্য পরিচালনায় ও যুদ্ধবিগ্রহে যোগ দিত। জমিজমা তাদের

দখলেই থাকত বেশি। মধ্যবিত্তরা নিজেদের জমি চাষ করে জীবন কাটাত। গরীবদের জমি থাকত না। মজুরির বিনিময়ে অন্যের জমিতে কাজ করা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। যুদ্ধে যারা বন্দী হত, তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা। হোমারের যুগে গ্রীকদের মধ্যে প্রথমে ব্যবসাবাণিজ্যের তেমন উন্নতি হয়নি। তখন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। গরু, ভেড়া ও শস্যের বিনিময়ে জিনিসপত্র বেচাকেনা হত। সমুদ্রপথে জাহাজে ডাকাতির অভাব ছিল না।

ধর্মমত—সমাজে ধর্মের প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং প্রবল। গ্রীকরা মানুষের সুস্থ সবল ও সুন্দর রূপের ধ্যানধারণা দিয়েই দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করত। তারা বহু দেবদেবীর উপাসনা করত। পুরোহিতের

এথেনা

জিয়াস

এপোলো

সাহায্যে দেবদেবীর অনুমতি নিয়ে তারা কোন কাজে নামত। গ্রীকদের প্রধান দেবতা জিয়াস। তিনি ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা। তাঁর পুত্র এপোলো সূর্যদেবতা। তিনি আলো ও সত্যেরও দেবতা।

গ্রীসে এর অনেক মন্দির ছিল। জিয়াসের কন্যা এথেনা কৃষি, শিল্প ও জ্ঞানের দেবতা। ইনি চিরকুমারী। এথেন্সের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে এঁর খুবই সমাদর। এঁর মন্দিরটিও খুবই সুন্দর।

নগররাষ্ট্র—হোমারের যুগে গ্রীকরা প্রধানত গ্রামে বাস করত। তবে এই যুগের শেষ দিকে তারা গ্রামজীবন ছেড়ে দল বেঁধে নগরজীবন শুরু করে। এই পরিবর্তনের ব্যাপারে গ্রীকরাজাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রথমে রাজারা প্রাসাদ বা দুর্গকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে তোলে। পাহাড়গুলোর মাঝে সংকীর্ণ সমতলভূমিতে এই সব শহর অবস্থিত ছিল। এক একটি শহর নিয়ে এক একটি রাষ্ট্র হত বলে তাদেরকে নগররাষ্ট্র বলা হত। নগররাষ্ট্রে অবশ্য জনসংখ্যা বেশি থাকত না। কিন্তু নগর প্রতিষ্ঠার ফলে শাসনকার্যে অভিজাতশ্রেণীর স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণ নগররাষ্ট্রে রাজার ত্রুটিবিচ্যুতি বা অন্যায় আচরণের কথা জানতে পারত। সেই মত রাজার ক্ষমতাও তারা কমাতে পারত। রাজা অন্যায় কাজ বন্ধ না করলে তারা রাজাকে শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত করত। এই ভাবে গ্রীসের নগররাষ্ট্রে গণতন্ত্র ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছিল। কোন কোন নগররাষ্ট্রে দুজন রাজাও ছিল। অবশ্য ক্রীতদাস ও মেয়েদের ভোট দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না।

সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান—গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক একতা ছিল না বটে, কিন্তু সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ছিল। ফলে সমগ্র গ্রীসে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। সাংস্কৃতিক লেনদেন ঘটার নানা কারণ ছিল। গ্রীকরা নিজেদেরকে একই পূর্বপুরুষের বংশধর মনে করত। বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের ভাষা ও সাহিত্য এক ছিল। তারা একই ধর্ম পালন করত, একই উপাসনায় বিশ্বাস করত। তাছাড়া জাতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান ছিল মিলনের একটি সূত্র। অলিম্পিয়া নামক স্থানে সব রাষ্ট্র থেকে গ্রীকরা চার বছর অন্তর মিলিত হত ও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। এই ভাবেও গ্রীসে ঐক্য দৃঢ় হয়েছিল।

উপনিবেশ স্থাপন—খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীকরা নানা দেশে

নানাস্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই সব স্থানের মধ্যে এশিয়া মাইনর, ঈজিয়ান সাগরের ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী এলাকা, ইটালি, সিসিলি ও স্পেনের নাম উল্লেখ করা যায়। গ্রীকদের এই উদ্যোগের পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল। প্রথমত, গ্রীসের অনুর্বর মাটিতে দেশবাসীদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট খাদ্যশস্য হত না। তাই ব্যবসাবাণিজ্যের তাগিদে বিদেশে উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, মাতৃভূমিতে যে গ্রীকরা অপমানিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, তারা রাজনৈতিক কারণে দেশ ছেড়ে গিয়ে বিদেশে উপনিবেশ গড়ে তুলতে চাইল। উপনিবেশ স্থাপনের ফলে গ্রীকরা নানাভাবে লাভবান হয়েছিল। যারা বিদেশে বসবাস করতে থাকে, তারা সেখানে সুখেই জীবনযাপন করত। ফলে গ্রীসে জনসংখ্যার চাপ কমে যায়। খাদ্যের অনটন দূর হয় ও প্রাচুর্য দেখা দেয়। ভাল বাসস্থানেরও সুরাহা হয়। ভূমধ্যসাগরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে গ্রীকরা নৌবিদ্যায় সুদক্ষ হয়ে ওঠে। জলপথে বাণিজ্যের বেশ প্রসার হয়। নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে গ্রীকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরও উন্নত হয়।

এথেন্স ও স্পার্টা—তোমরা আগেই জেনেছ, প্রাচীন গ্রীস ছিল ছোট ছোট নগররাষ্ট্রের সমষ্টি। এই নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টার নামডাক খুব বেশি। সেই কথাই এখন তোমাদেরকে বলব।

এথেন্সে একে একে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও শেষে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজতন্ত্রের যুগে ধর্মীয় উৎসবের জাঁকজমক ছিল খুব বেশি। এথেন্সের বিশেষ নেতা সোলনের নাম নানা কারণে স্মরণীয়। তিনি বাণিজ্যে ও যুদ্ধে দক্ষ ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও কবিও ছিলেন। তাঁর হাতে ঋণ-সংক্রান্ত আইনের সংস্কার হয়। ফলে ঋণের দায়ে তখন থেকে কেউ কাউকে দাসে পরিণত করতে পারত না। মুদ্রা-সংস্কারের ফলে বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়। পিতা যদি পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতেন, তবেই তিনি পুত্রের কাছে পরে ভরণপোষণ পাওয়ার যোগ্য হতেন। এই আইনের ফলে এথেন্সে শিক্ষার যথেষ্ট

বিস্তার ঘটেছিল। শিশুদের ব্যায়ামকৌশল ও সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। এতে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সুযোগ ঘটেছিল। সোলনের যুগে এথেন্সের মানুষ আয়ের হিসেবে চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে মানুষকে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হত। 'বুলে' পরিষদে চার শ্রেণীরই প্রতিনিধি নেওয়া হত। পরবর্তী আমলে আরও অনেক সংস্কার হয়েছিল। ধনী গরীব সবার জন্য সরকারী চাকরির অধিকার, গণ-আদালতের ক্ষমতাবৃদ্ধি, স্বদেশপ্রেম প্রচার—ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এথেন্সে তরুণদের যুদ্ধবিদ্যা ও নাগরিক কর্তব্যের শিক্ষা দেওয়া হত। তারা একুশ বছর বয়সে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার পেত। নগররক্ষা ও দুর্গরক্ষা ছিল যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ তরুণদের বিশেষ কাজ। সংসারের কাজ ছাড়াও এথেন্সের মেয়েদের লেখাপড়া, কাপড় বোনা, সুতো কাটা ও গানবাজনার শিক্ষা দেওয়া হত।

জীবনযাত্রা সরল ছিল, জীবিকা অর্জনও সহজ ছিল। তাই এথেন্সের নাগরিকরা বহু সময় পথে ঘাটে ও বাজারে গালগল্প ও আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটাত। স্বাধীন নাগরিকরা রাষ্ট্রের কাজে অংশ নিত। বিকালে নাগরিকরা রাষ্ট্রসভায় উপস্থিত হত। বিচারে জুরিপ্রথা চালু ছিল।

স্পার্টা—স্পার্টার রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক নাগরিককে যোদ্ধা করে গড়ে তোলা। তারা রাজ্য বাড়াত। ফলে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। তাই সাত বছর বয়সে শিশুদেরকে মা-বাবার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হত রাষ্ট্রের অধীন। কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে তাদের শরীরচর্চা ও যুদ্ধবিদ্যা শেখান হত। এর ফলে আত্মবিশ্বাস, সুস্বাস্থ্য ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা তাদের হত। কিন্তু মানসিক উৎকর্ষ ও নৈতিক শিক্ষাদীক্ষার দিকে তেমন নজর দেওয়া হত না। শিক্ষা যা ছিল তা সম্পূর্ণ সরকারী প্রয়োজনে। বিশ বছর বয়সে যুবকরা সৈন্যদলে যোগ দিত। ত্রিশ বছর বয়সে তারা নাগরিকের মর্যাদা পেত ও বাড়িতে থাকতে পারত। কিন্তু ষাট বছর বয়স পর্যন্ত যুদ্ধবিদ্যার চর্চা রাখতে হত।

মেয়েদের জন্যও ব্যায়ামের কড়া নিয়ম ছিল। এইভাবে যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা ও কঠোর নিয়মের ফলে স্পার্টার বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরা স্থলযুদ্ধে খুবই পটু ছিল। নাগরিকরা কেউ বিলাসিতা করতে পারত না। সামাজিক জীবনযাত্রা ছিল সরল। স্পার্টানদের বীরত্ব ও সরলতা প্রবাদের বিষয়। কিন্তু ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি বিকাশের কোন সুযোগ সেখানে ছিল না।

স্পার্টাতে রাজা থাকতেন দুজন। সম্ভবত দুই জাতির মিলনের ফলে দুপক্ষের রাজার কর্তৃত্বের জন্যই এই ব্যবস্থা চালু হয়। যুদ্ধের সময় একজন যুদ্ধ চালাত, আর একজন রাজ্য শাসন করত। দুজনেই উত্তরাধিকার-সূত্রে দুই পৃথক রাজবংশ থেকে রাজা হত। দুজনেরই সমান ক্ষমতা থাকত। তবে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজাদের কর্তৃত্ব তেমন বেশি ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ষাটবছর বয়সের উপরে উপযুক্ত আটাশ জন ও দুই রাজাকে নিয়ে 'গেরুসিয়া' (Gerusia) নামে ত্রিশ জনের একটা পরিষদ থাকত। এই পরিষদ নানা অপরাধের বিচার করত। এছাড়া জনসাধারণের একটি অ্যাপেলা বা গণপরিষদ থাকত। ত্রিশ বছর বয়সের উপরের প্রত্যেক নাগরিক এর সভ্য হত। প্রতি মাসে এর অধিবেশন হত। কিন্তু এই পরিষদের কোন বিশেষ ক্ষমতা বা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। আর থাকত একটি পরিচালকমণ্ডলী। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে এই মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকত। এই দুটোর শাসনতন্ত্রের কাঠামোকে একটা বিশেষ সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা যায় না। এতে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র—এই দুইয়ের এক প্রকার জটিল সমন্বয় বলা চলে।

এথেন্স বনাম স্পার্টা—এথেন্স ও স্পার্টার সম্বন্ধে যেটুকু শুনলে তাতেই বুঝতে পার, এই দুই নগররাষ্ট্রের মধ্যে নানা দিক দিয়ে নানা-রকমের তফাৎ ছিল। এথেন্সে হয়েছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। স্পার্টায় হয়েছিল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, ও প্রজাতন্ত্রের এক জটিল সমন্বয়। এথেন্স ছিল জলযুদ্ধে পটু, স্পার্টা ছিল স্থলযুদ্ধে দক্ষ। স্পার্টার কাছে গায়ের জোর ও সামরিক শক্তিই ছিল বড় কথা। নৈতিক বা মানসিক

উৎকর্ষের দিকে তাদের নজর ছিল না। পক্ষান্তরে এথেন্সে শক্তি-চর্চার সঙ্গে সংস্কৃতি-চর্চার পরিমাণ ছিল বেশি। এথেন্সের গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য এথেন্সের অভিজাত সম্প্রদায় স্পার্টার রাজা ক্লিওমিনিসের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু সেখানকার সাধারণ বাসিন্দা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন অভিজাতরাই ভয়ে এথেন্স থেকে পালায়।

এর পর স্পার্টার রাজা ক্লিওমিনিস এথেন্স আক্রমণ করার জন্য থিবীয় ও কাল্ডীয় রাজাদের সাহায্য চান। কিন্তু তাঁরা তাতে রাজী হননি। কারণ এথেন্সের গণতন্ত্র তাঁরা ধ্বংস করতে চাননি। এদিকে এথেন্স এই সুযোগে পাশের শত্রুরাজ্যগুলি জয় করে নেয়। বহু পরে পারস্য সম্রাট দেরিয়াস ও তাঁর পুত্রের আক্রমণে গ্রীস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৪৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ মাঝখানে কয়েকবছর বন্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৪ অব্দে যুদ্ধ শেষ হয়। এথেন্সের উন্নতি দেখে ঈর্ষ্যাবশত স্পার্টা ও তার সহযোগী দেশ এবং পারস্যসম্রাট একজোটে এথেন্সের শত্রুতা করে। শত্রুদের বিরুদ্ধে এথেন্স খুবই বীরত্ব দেখায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এথেন্সকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক জীবন—রাজ্যজয়, নৌবিদ্যা ও সৈন্য পরিচালনায় এথেন্সের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তবে তাদের আসল গৌরব ছিল সংস্কৃতিতে। এথেন্সের সাহিত্য ও উচ্চ চিন্তা আজও আমাদের অবাক করে। জনগণ সাহিত্য-চর্চা করার অবাধ সুযোগ পেয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার ও আনন্দ দানের দিকে নজর রাখা হত। নাগরিকরা বিনা খরচায় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যেতে পারত। গ্রীক সাহিত্যে নাটক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়। শ্রেষ্ঠ চারজন নাট্যকার হলেন ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপাইডিস এবং এরিষ্টোফেনিস। এই সব নাট্যকার এথেন্সের মানুষ ছিলেন।

এথেন্সে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন মেলে মন্দির, সরকারী গৃহ ও সুন্দর মূর্তি রচনায়। শাদা মার্বেল পাথরের তৈরি পার্থিনন মন্দির শিল্পকীর্তির অনুরূপ নিদর্শন।

এটি আজও টিকে আছে। এই মন্দিরে এথেন্সের রক্ষাকর্ত্রী দেবী এথেনার মূর্তি বহু দূর থেকে দেখা যেত।

এথেন্সের মানুষ ধর্ম ও দেবদেবীর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। ফলে সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ফলে তাদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ক্রমে শিথিল হয়। এথেন্সে দর্শন-শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। মানুষের সৃষ্টি ও মন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দার্শনিকরা নানা প্রশ্ন আলোচনা করেছেন। এই-ভাবে এথেন্সে যে সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে, তা গ্রীস ও গ্রীসের বাইরে অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরবর্তী কালে ইউরোপের সভ্যতার ভিত্তি রচনা করে। এই প্রসঙ্গে এথেন্সের আরও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা তোমাদের বলি।

পেরিক্লিস—পেরিক্লিস ছিলেন এথেন্সের গণতান্ত্রিক দলের নেতা। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল এথেন্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিস্তার করা। তিনি বহুদিন ধরে এথেন্সের শাসনকাজ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষিত ছিলেন। বক্তা ও সেনাপতি হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। মার্জিত রুচি ও অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন। তাঁর আমলে এথেন্সে শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও দর্শনে প্রভুত উন্নতি হয়। জ্ঞানী, গুণী ও শিল্পীদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। এই সব কারণে পেরিক্লিসের যুগকে এথেনীয় ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ বলা হয়।

পেরিক্লিস

পেরিক্লিসের রাজনৈতিক শত্রুরা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। তবে জীবনের শেষ পর্বে তিনি আবার জনপ্রিয়তা লাভ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৯ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সফোক্লিস—সফোক্লিস ছিলেন পেরিক্লিসের যুগের বিখ্যাত নাট্যকার। তিনি আঠারখানির বেশি নাটক লেখেন। তবে তাঁর

সাতখানি নাটকের বিষয়বস্তু হারকিউলিসের মৃত্যু। তাঁর লেখা 'কিং ওডিপাস' নাটক আজও সকলকে অভিভূত করে। বিয়োগান্ত নাটক রচনায় ইস্কাইলাসের পরই তাঁর খ্যাতি। প্রত্যেকটি নাটকে তিনি নায়ক ও অন্যান্যদের জীবন ও চরিত্র বড় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনের মূল্য ও আদর্শ তাঁর নাটকের বড় কথা।

সক্রেটিস—বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস প্রথম জীবনে প্রস্তর-শিল্পী ছিলেন। তাঁর বাবাও এই শিল্পে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু নতুন যুক্তিবাদের প্রভাবে সক্রেটিসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। সত্য ও ন্যায়ের আলোকে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করাই হল তাঁর সাধনা। এথেন্সের রাজপথে তিনি নানা মানুষের সঙ্গে নানা কথার আলোচনায় তর্ক জুড়ে দিতেন। প্রচলিত ভুল ধারণাকে তিনি আঘাত করতেন। এজন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমালোচনা করতেও তাঁর কুণ্ঠাবোধ ছিল না। বিচারবুদ্ধি অনুসারে সৎ জীবনযাপনের উপদেশ তিনি মানুষকে দিতেন। সক্রেটিসের শত্রুরা তাঁর এই সব মতপ্রচারে খুশি হয় নি।

সক্রেটিস

তারা সক্রেটিসকে অধর্ম ও গণতন্ত্রের শত্রুতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বিচারে বিষপানে তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থির হয়। সক্রেটিস আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি। তিনি হাসিমুখে বিষপান করেন। দার্শনিক প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। তিনি গুরুর 'কথোপকথন' গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত এরিস্টোটল প্লেটোর শিষ্যস্থানীয়।

হিরোডোটস—খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৪ অব্দে হিরোডোটসের জন্ম। তিনি উচ্চ পরিবারের মানুষ ছিলেন। নানা দেশে ভ্রমণের পর তিনি এথেন্সে এসে সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। এশিয়ার বিভিন্ন

দেশ, গ্রীস ও মিশরের ইতিহাস তিনি লিখে গিয়েছেন। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের যুদ্ধের বিশদ বিবরণও তিনি লেখেন। ভূগোল ও নৃতত্ত্বে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির মানুষের সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেন। গ্রীসের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় তাঁর ভূমিকা অসামান্য। হিরোডোটস এথেন্সের গণতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। ইতিহাস রচনার জনক হিসাবে তিনি বিশেষ সম্মানিত।

হিরোডোটস

ম্যাসিডন—এবার তোমাদের গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের কথা বলব। গ্রীকরা ম্যাসিডনকে ঘৃণার চোখে দেখত। কারণ, যুদ্ধপ্রিয় ম্যাসিডনবাসীরা খুব সভ্য ছিল না। শিকার ও কৃষিকাজ নিয়ে তাদের জীবন কেটে যেত। ফিলিপ রাজা হওয়ার পর ম্যাসিডন নতুন যুগে প্রবেশ করে। ফিলিপের নেতৃত্বে ম্যাসিডন শিক্ষাদীক্ষায় বড় হয়ে ওঠে। পুত্র আলেকজাণ্ডারকে তিনি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। পুত্র আলেকজাণ্ডারের সাফল্যই ফিলিপের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান—৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজা ফিলিপের মৃত্যু হয়। পুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যের ভার পান। প্রথমেই তিনি কয়েকটি বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হন। তারপর তিনি মন দেন দিগ্বিজয়ের দিকে। গ্রীকজাতির নেতা হিসাবে তিনি এশিয়া জয় করার সঙ্কল্প করেন। তখন পারস্যের সম্রাট ছিলেন তৃতীয় দেরিয়াস। আলেকজাণ্ডারের হাতে অতি সহজেই তার পরাজয় ঘটে। আলেকজাণ্ডার এশিয়া মাইনর জয় করেন। এর পর

আলেকজাণ্ডার মিশরের দিকে যান এবং অনায়াসে মিশর জয় করেন। নীলনদের তীরে তাঁর নামে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহর গড়ে তোলেন। ব্যাবিলনের পর ব্যাকট্রিয়া জয় করে তিনি ভারতের সীমান্তে হাজির হন। হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তিনি উপস্থিত হন। সে অঞ্চল তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কয়েক জন রাজা বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করেন।

আলেকজাণ্ডার

এক সামন্ত রাজা পুরু বীরবিক্রমে আলেকজাণ্ডারের গতি রোধ করেন। তবে পুরুকেও পরাজয় মানতে হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার বন্দী পুরুকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি আমার কাছে কেমন ব্যবহার আশা করেন?' পুরু তার উত্তরে জানান যে, রাজার কাছে রাজার যে ব্যবহার পাওয়া উচিত, তাই তিনি পেতে চান। পুরুর বিক্রম ও সাহস দেখে মুগ্ধ আলেকজাণ্ডার তাঁকে মুক্ত করে দেন। এই ভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। সমগ্র উত্তরভারত জয় করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা আর এগোতে চায়নি। সম্ভবত তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া মগধ সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপের কথাও তাদের কাছে নিশ্চয় পৌঁছেছিল। উত্তরভারতে তখন নন্দ রাজবংশের কর্তৃত্ব চলছিল। এই প্রথম আলেকজাণ্ডারকে থামতে হয়। তিনি এদেশ ছেড়ে যান ও নিজেকে পারস্যের সম্রাট বলে ঘোষণা

করেন। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হঠাৎ ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরও গ্রীকরা বহুদিন ভারতসীমান্তে শাসক হিসেবে ছিল।

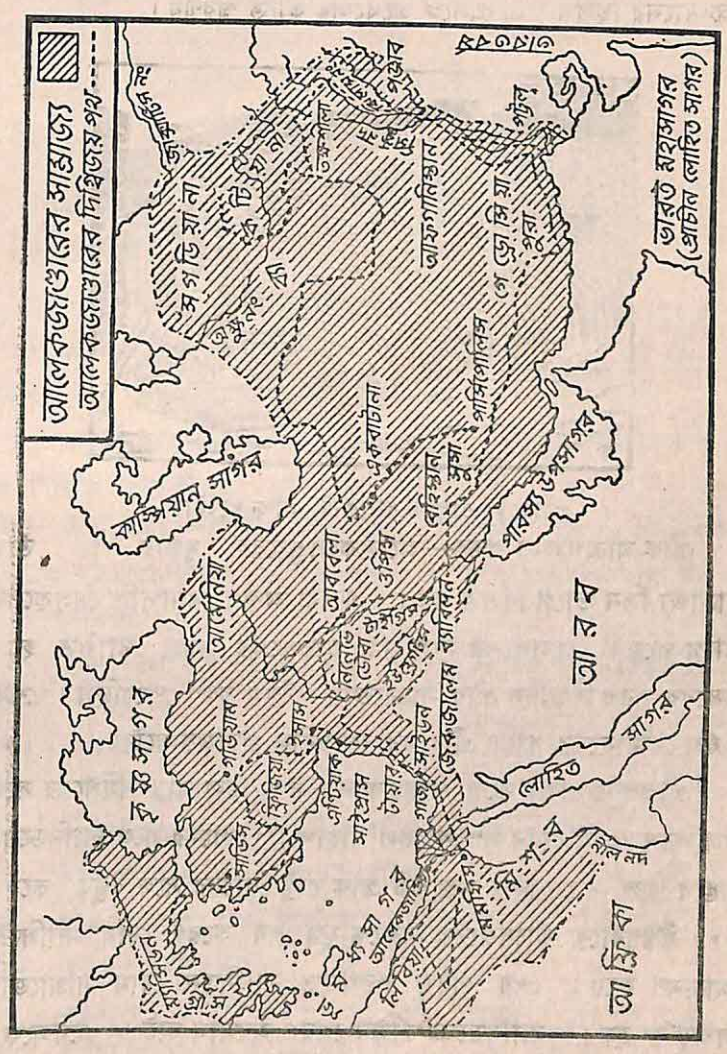

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান ঘটতে থাকে। এই ভাবে উভয় দেশ পরস্পরের উপকারে এসেছিল।

গ্রীসের স্থাপত্য শিল্প—গ্রীসের স্থাপত্য শিল্পে জাঁকজমক ছিল। বড় বড় মন্দির, সভাগৃহ, নাট্যমঞ্চ (এম্ফিথিয়েটার) ও নানা ভাস্কর্য উচ্চ মানের ছিল। এ প্রসঙ্গে এথেন্সের কীর্তি স্মরণীয়।

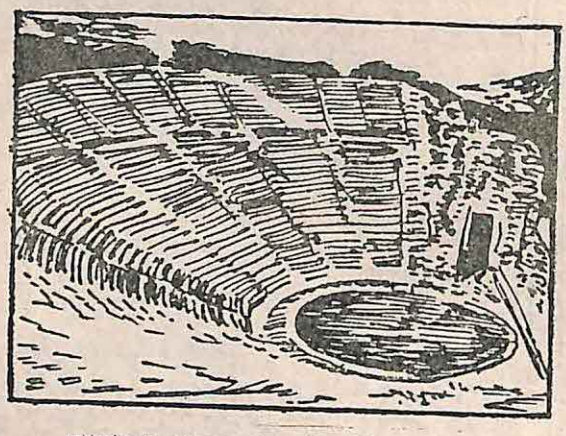

পাহাড়ের ঢালুতে ধাপকাটা এম্ফিথিয়েটার

গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন—অলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এশিয়া অঞ্চল সেনাপতি সেলুকসের ভাগে পড়ে। সেলুকসের সঙ্গে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এসবের পরও কিছুদিন গ্রীক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রোমানদের হাতে গ্রীকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

গ্রীকশক্তিগুলির মধ্যে পরে কোনও ঐক্য ছিল না। মিশরের সঙ্গে ম্যাসিডন ও সিরিয়ার সম্পর্ক ছিল খারাপ। রোমের সঙ্গে ম্যাসিডনের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু অন্য দুটি গ্রীক রাষ্ট্র রোমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্থেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করেই রোম ম্যাসিডন আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত পরাজিত ম্যাসিডন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ম্যাসিডনের রাজবংশেরও অবসান ঘটে। এথেন্সকেও রোমের কাছে অপমানিত হতে হয়। এই ভাবে গ্রীস তার স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হারায়।

রোম গ্রীসের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল সত্য। কিন্তু গ্রীস থেকে শিখেছিল সে অনেক কিছু। গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি রোমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। হোমারের যুগের গ্রীকসমাজ ও রাজনীতির পরিচয় দাও।

২। স্পার্টার সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতির পরিচয় দাও।

৩। এথেন্সের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় কিরূপ ?

৪। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখ।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ক্রীটদ্বীপের সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে কি জান ?

২। গ্রীসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান কিভাবে চলত ?

৩। প্রাচীন গ্রীকরা কেন বিদেশে উপনিবেশ গড়েছিল ? এর ফল কি হয়েছিল ?

৪। এথেন্স ও স্পার্টার সম্বন্ধ কেমন ছিল ? দু একটি উদাহরণ দাও। এমন সম্পর্কের কারণ কী ?

৫। টীকা লেখ—সক্রেটিস, সফোক্লিস, পেরিক্লিস্, হিরোডোটস, বুলে পরিষদ, ও আগোরা পরিষদ, গেরুসিয়া পরিষদ ও আপেলা পরিষদ, রাজা পুরু।

[গ] বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। 'হ্যাঁ বোঝাতে টিক চিহ্ন (✓), ও না বোঝাতে কাটা চিহ্ন (×) দাও :—

ক। হিরোডোটস স্পার্টার বাসিন্দা ছিলেন।

খ। গ্রীসদেশ ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত।

গ। স্পার্টার সভ্যতা এথেন্সের সভ্যতার চেয়ে উন্নত ছিল।

ঘ। আলেকজাণ্ডার মগধ আক্রমণ করেছিলেন।

ঙ। গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল রোমের হাতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) গ্রীসে জনসাধারণের সমিতির নাম ছিল —।

(খ) গ্রীসের প্রসিদ্ধ এক নগররাষ্ট্রের নাম —।

(গ) এথেন্সে গণতান্ত্রিক দলের নেতা ছিলেন —

———

S.C.E.R.T., West Bengal Library 25/3, B. C. Road Calcutta

তিন রোমের কথা

রোমের পত্তন—এবার তোমাদেরকে রোম নামে আর একটি প্রাচীন রাষ্ট্রের কথা বলব। টাইবার নদীর মোহানা থেকে পনের মাইল দূরে রোমের অবস্থান। প্রায় পৌনে তিন হাজার বছর আগে রোম নগরের পত্তন হয়। ক্রমে এই নগর খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সমগ্র ইটালির কর্তৃত্ব দখল করে। একটি উন্নত সভ্যতা এই নগরটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। প্রথমে একটি মাত্র পাহাড়ের চূড়ায় নগরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সাতটি পাহাড়ের চূড়া নিয়ে রোমনগর বেড়ে ওঠে। রোমনগরের ভাষা ছিল ল্যাটিন। রোমান লিপি আজও পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। তোমরা যে ইংরেজী লেখ সেটা রোমান লিপি।

রোমের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি গল্প চালু আছে। প্রাচীন ইটালির আলবালঙ্গা রাজ্যের রাজা ছিলেন নমিটর। ছোট ভাই এমুলিয়াস দাদা নমিটরকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে ও তার পুত্রদের হত্যা করে। নমিটরের কন্যা সিলভিয়াকে দেবদাসী করা হয়। রণদেবতার বরে সিলভিয়ার দুটি পুত্র হয়। তখন এমুলিয়াসের নির্দেশে ছেলে দুটিকে টাইবার নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই ছেলে দুটির নাম রমুলাস ও রেমাস। তারা ভাসতে ভাসতে যেখানে আটকে যায়, কালে সেখানেই রোমনগর গড়ে ওঠে। প্রথমে একটি বাঘিনী নিজের দুধ দিয়ে এদেরকে বাঁচায়, ও পরে এক মেষপালক তাদের রক্ষা করে। এরা বড় হলে অত্যাচারী এমুলিয়াসকে এদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পরে একটি কলহে রমুলাসের হাতে ছোট ভাই রেমাসের প্রাণ যায়। রমুলাস রোমের প্রথম রাজা হন। রমুলাসের নাম থেকে সেই রাজ্যের নাম হয় রোম। এর পর সাতজন রাজা একে একে রোম শাসন করেছিলেন। তারপর জনসাধারণ রাজাকে সরিয়ে দিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম দিকে অভিজাতদের প্রভাব ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশ জনসাধারণ অধিকার অর্জন করে।

কার্থেজের সঙ্গে বিরোধ ও রোমের সাম্রাজ্য বিস্তার—৮২৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ফিনিসীয় জাতি এশিয়া মাইনরে কার্থেজ নামে এক নগর পত্তন করে। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে কার্থেজ ছিল ফিনিসীয় উপনিবেশ। বাণিজ্য ছিল এদের মূল জীবিকা। সমুদ্রপথে এদের বাণিজ্য চলত। তাই তারা শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলে। ভূমধ্যসাগরের জলপথে তারা সিসিলির অধিকাংশ, কর্সিকা ও সার্দিনিয়া দ্বীপ সব দখলে আনে।

এই কার্থেজের সঙ্গে রোমের বিরোধ বাধে। পর পর তিনটি যুদ্ধ হয়। এই সব যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত। সিসিলির ওপর আধিপত্য নিয়ে এই বিবাদের শুরু। দীর্ঘ চব্বিশ বছর যুদ্ধের পর রোম জয়লাভ করে। দুপক্ষে শান্তি চুক্তি হয়। তাতে কার্থেজ রোমের হাতে সিসিলির দখল ছেড়ে দেয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ বছরের মধ্যে রোম ৩২০০ সুবর্ণমুদ্রা পাবে স্থির হয়। এই ভাবে সিসিলি রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এর ফলে রোমের প্রচুর আর্থিক লাভ হয়। সমুদ্রপথে তার বাণিজ্যও প্রতিষ্ঠা পায়।

কুড়ি বছর শান্তিতে চলার পর আবার রোম ও কার্থেজের মধ্যে কলহ শুরু হয়। এবার যুদ্ধে কর্সিকা ও সার্দিনিয়া দ্বীপ কার্থেজের হাতছাড়া হয়ে রোমের দখলে আসে। কার্থেজের সেনাপতি হ্যামিলকার বার্ক স্থলপথে হামলার জন্য স্পেনকে ঘাঁটি করেন। তাঁর পুত্র হ্যানিবল পিতার কাছে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২১৮ অব্দে হ্যানিবল সৈন্যসামন্ত নিয়ে রোমের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথম কয়েকটি যুদ্ধে হ্যানিবলের কাছে রোম পরাজিত হয়। কিন্তু পরে যুদ্ধের গতি ফিরে যায়। রোম স্পেনে জয়লাভ করে ও ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে কার্থেজ আক্রমণ করতে আফ্রিকা যায়। হ্যানিবল তখন কার্থেজ রক্ষায় যেতে বাধ্য হন। কিন্তু জামার যুদ্ধে হ্যানিবলের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। কার্থেজ বাধ্য হয়ে সন্ধি করে, রোম ওদের নৌবহর নিয়ে নেয় এবং স্পেনে রোমের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। হ্যানিবল শেষ পর্যন্ত হতাশায় বিষপানে তাঁর জীবন শেষ করেন।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর রোম ও কার্থেজের

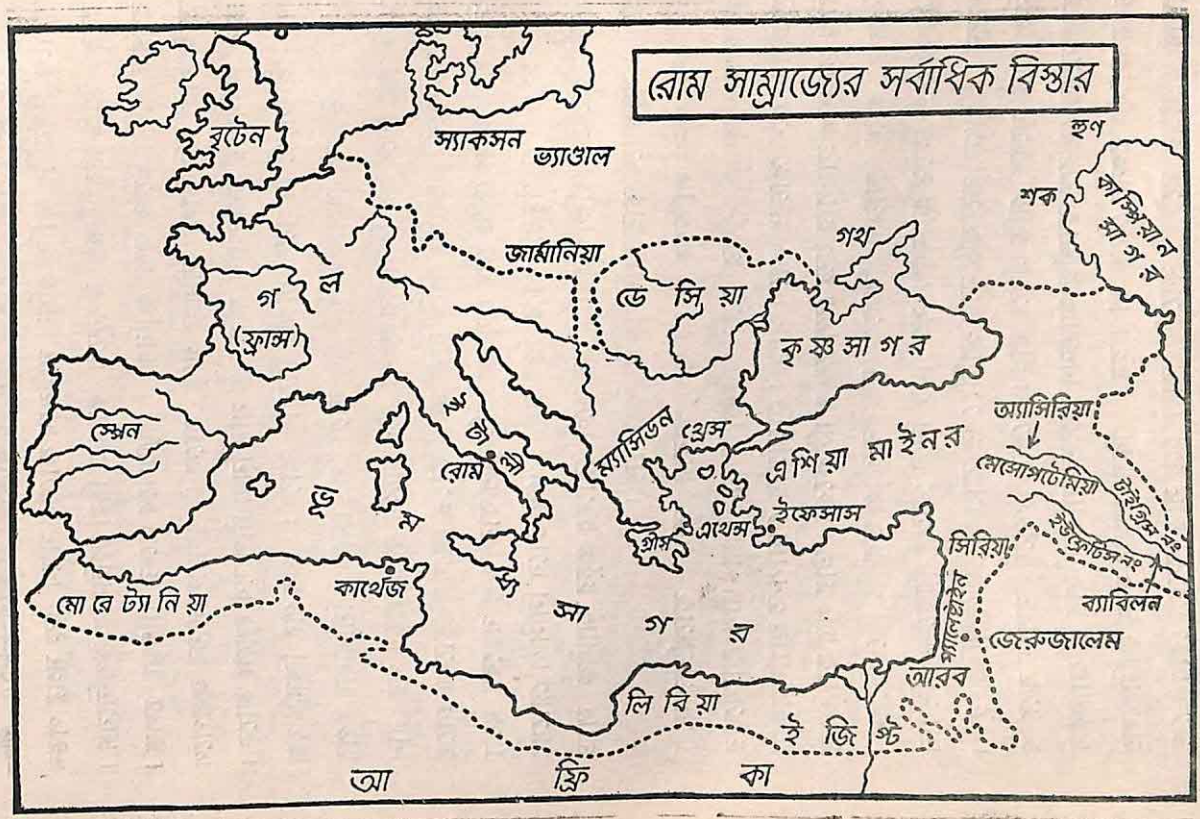

রোম সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার
ব্রিটেন
স্যাকসন ভাণ্ডাল
জার্মানিয়া
গল
(ফ্রান্স)
স্পেন
কার্থেজ
রোম
ম্যাসিডন
থ্রেস
এথেন্স
কৃষ্ণ সাগর
আর্মেনিয়া
মেসোপটেমিয়া
সিরিয়া
প্যালেস্টাইন
জেরুজালেম
ব্যাবিলন
আরব
লিবিয়া

মধ্যে আবার যুদ্ধ হয়। এই তৃতীয়বারের যুদ্ধে কার্থেজ চূড়ান্তভাবে হার মানে। রোম এবার নৃশংসভাবে কার্থেজ নগরটি ধ্বংস করে দেয়। এইভাবে দুটি ভিন্ন সভ্যতার বিরোধে শেষ পর্যন্ত রোমের সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটে। পরবর্তী কালে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি ও এশিয়ার সিরিয়াও রোমের অধীন হয়। ক্রমে ইংলণ্ড পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

প্রাচীন রোম সমাজ—রোমের সমাজ ছিল পরিবারের সমষ্টি। পিতা ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাঁকে প্যাট্রেস বলা হত। ছেলে-মেয়ে ও দাসদাসীর ওপর তাঁর প্রভুত্ব ছিল।

রোমে দুই শ্রেণীর মানুষ ছিল। তার মধ্যে অভিজাত শ্রেণী প্যাট্রিসিয়ান (Partician) নামে পরিচিত। সাধারণ মানুষকে বলা হত প্লিবিয়ান (Plebian)। পণ্ডিতরা বলেন, যারা রোম নগরের প্রথম থেকে বাসিন্দা, সেই ল্যাটিনগোষ্ঠীর পরবর্তী বংশধরদের প্যাট্রিসিয়ান বলা হত। যারা বাইরে থেকে এসেছিল রোমে, অথবা যারা অভিজাতদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল, তাদের বলা হত প্লিবিয়ান। পূর্বপুরুষরা যে বংশের দাস ছিল, দাসত্ব থেকে মুক্ত প্লিবিয়ান সেই বংশের অনুগত হত। প্লিবিয়ানদের ক্ষমতা ও অধিকার তেমন বিশেষ ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তারা নিম্ন শ্রেণীতে গণ্য হত। তাদের কোন ধর্মীয় অধিকার ছিল না। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তারা যোগ দিতে পারত না। এজন্য কোন প্লিবিয়ানের পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া সম্ভব ছিল না। কারন ম্যাজিস্ট্রেটরা রোমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অনেক কাজ সমাধা করতেন। অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণী সমাজ ও রাজনীতিতে নানা সুখসুবিধা ভোগ করত। তাদের 'সিনেট' নামে এক প্রধানদের সভা ছিল—আইন কানুন তৈরি করত।

অবশ্য প্লিবিয়ানরা রোমের নাগরিক ছিল। তাদের ভোট দেবার অধিকারও ছিল। কিন্তু কোন উচ্চ রাজনৈতিক পদ তারা পেত না। প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধও তাদের হতে পারত না। প্লিবিয়ানরা অভাবের দায়ে অভিজাতদের কাছে টাকা ধার করতে বাধ্য হত। ধার শোধ করতে না পারলে ঋণদাতার কাছে দাসত্ব করার

আইন ছিল। ঋণদাতার ইচ্ছায় মৃত্যুদণ্ড হতেও কোন বাধা ছিল না। এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য প্লিবিয়ানদেরা চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষে বিরক্ত হয়ে প্লিবিয়ানরা রোম ছেড়ে চলে যায়। তারা 'সেক্রেড মাউণ্ট' নামক জায়গায় নতুন শহর গড়ে তোলে। তখন প্যাট্রিসিয়ানরা নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝতে পারে। বীর প্লিবিয়ানদের সাহায্য ছাড়া রোম রক্ষা ছিল অসম্ভব। তাই প্লিবিয়ানদের অনেক দাবি মেনে নেওয়া হয়। তারা ঋণের দায় থেকে মুক্তি পায়। উচ্চপদের অধিকার পায়। তাদের দাবি মত লিখিত আইনেরও ব্যবস্থা হয়।

রোমের নাগরিক—রোমের নাগরিকরা উচ্চ সম্মান ভোগ করত। তাই রোমের নাগরিকতা লাভ করার জন্য অনেকেরই বেশ লোভ ছিল। রোম ইটালির ওপর সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও সেখানকার বাসিন্দাদের নাগরিক অধিকার দিতে চাইত না। ইটালীয়দের সেই দাবি আদায়ের চেষ্টা বিফল হলে তারা ৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিদ্রোহ করে! ফলে রোমানরা বাধ্য হয়ে উদার ভাবে নাগরিক অধিকার দিতে থাকে। তাতে রোমের নাগরিক সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

রোমের ক্রীতদাস

দাসত্ব প্রথা ও দাসবিদ্রোহ—রোমের সভ্যতা উন্নত ছিল সত্য। কিন্তু দাসদের শ্রমের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। রোমের রাস্তা-ঘাট, মন্দির, প্রাসাদ এসব দাসদের শ্রমেই গড়ে উঠেছিল। আশ্চর্যের কথা, সভ্য রোম ক্রীতদাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। তাদের ওপর নানা অত্যাচার চালাত। একের পর এক রাজ্য জয়ের সঙ্গে রোমের দাসসংখ্যা বাড়তেই থাকে। যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তিদের দাসে

পরিণত করা হত। সামান্য খাবারের বিনিময়ে বিনা বেতনে তাদের দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করতে হত। কিন্তু তাদের সঙ্গে মনিবদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ছিল নিত্যকার ঘটনা। এজন্য দাসরা এন্নাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। অবশ্য রোমানরা এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে ১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাসরা আবার বিদ্রোহ করে। রোমানরা সেই বিদ্রোহও দমন করে।

স্পার্টাকাস—এই প্রসঙ্গে স্পার্টাকাসের নাম উল্লেখযোগ্য। রোমের নাগরিকরা আনন্দ পাবার জন্য হিংস্র পশুদের সঙ্গে ক্রীতদাসদের যুদ্ধ করাত। এদেরকে গ্লাডিয়েটর বলা হত। গ্লাডিয়েটররা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ করতে বাধ্য হত। নাগরিকদের মনোরঞ্জনের জন্য এইসব যুদ্ধক্রীড়া অনুষ্ঠান হত। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে একদল গ্লাডিয়েটর এই নিষ্ঠুর রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বহু পলাতক ক্রীতদাস সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিদ্রোহী স্পার্টাকাস দুই বছর ইটালির নানা জায়গায় লুঠপাট চালায়। ৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাসকে দমন করা হয়। তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

জুলিয়াস সিজার—এবার তোমাদের একজন বীরপুরুষের কথা বলব। তাঁর নাম জুলিয়াস সিজার। তিনি ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। ভাল বক্তা ও সেনাপতি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রথমে তিনি গণতান্ত্রিক দলের দিকে সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। স্পেন, মিশর ইত্যাদি দেশ জয় করে তিনি রোমের গৌরব বৃদ্ধি করেন। বৃটেন এবং জার্মানীতেও তিনি সৈন্য চালনা করেন।

জুলিয়াস সিজার

সিজারের সাফল্য ও খ্যাতি অনেকের হিংসার কারণ হয়ে ওঠে। সিজারের জামাই পম্পেও তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠেন। তখন রোমে

প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সিজার, পম্পে ও ক্র্যাসাস প্রভৃতি নেতার হাতে। সিজারের মেয়ে জুলিয়ার মৃত্যুর পর সিজার ও পম্পের বিরোধ চরমে ওঠে। তখন সেনবাহিনীর সাহায্যে সিজার সব ক্ষমতা নিজের দখলে আনেন। পম্পে গ্রীসে পালিয়ে যান। এই ভাবে রোমে কার্যত প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং একনায়ক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

এরপর সিজারকে ইম্পারেটর (Imperator) উপাধি দেওয়া হয়। চিরদিনের জন্য তাঁকে ডিক্টেটর (Dictator) নিযুক্ত করা হয়। তিনি দেবতার মত সম্মান লাভ করেন। এমনকি মন্দিরেও তাঁর মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রজাতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো বজায় থাকলেও আসলে সিজারের একনায়কতন্ত্রই চালু হয়। রাজা না হয়েও তিনি রাজসম্মান পান।

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও সিজার কিন্তু নানা ভাল কাজ করেছিলেন। তাতে জনসাধারণের বেশ উপকার হয়েছিল। তাঁর নির্দেশে ঋণব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। তাঁর সময়ে রাস্তাঘাট তৈরি করে রোমের শ্রীবৃদ্ধি করা হয়। রোমের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করে তিনি রোমসাম্রাজ্যের আয়তন বাড়ান। তিনি রোমের ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করেন। তাঁরই চেষ্টায় প্রতি চার বছর অন্তর 'লীপ ইয়ার' (Leap year) গণনার নিয়ম চালু হয়।

গল ও বৃটেনে যে সব অভিযান হয়, সেগুলির বিবরণ সিজার লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এতে তাঁর ইতিহাসবোধ ও সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় মেলে। তাঁর লেখায় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। শাসন-নৈপুণ্য, সংগঠনশক্তি ও শিক্ষা-দীক্ষার গুণে সিজার প্রাচীন পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

ব্রুটাস কেসিয়াসের নেতৃত্বে একদল লোক গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সিজারকে হত্যা করার চক্রান্ত করে। ৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিজার নিহত হন। কিন্তু সিজারের হত্যার পর গণতন্ত্র রক্ষা পায়নি। তাঁর সময়ে গণতন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তাও শেষ হয়ে যায়।

সিজারের পর তাঁর আত্মীয় ও পোষ্য অক্টেভিয়ান অগাষ্টাস উপাধি নিয়ে সর্বেসর্বা হয়ে রোমে পুরোপুরি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মিশরও কিছুটা দখল করেন। কিন্তু বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকে।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—সিজারের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য প্রায় পাঁচ শ' বছর টিকেছিল। সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র দুজন ভাল লোক শাসন চালান—এণ্টনিনাস পায়াস ও মার্কাস অরেলিয়াস। আর সব প্রায় অযোগ্য ছিলেন। ফলে ক্রমে ক্রমে শাসনব্যবস্থার নানা ত্রুটি দেখা দেয়। দেশবাসীর সাহস ও নৈতিক বল কমতে থাকে। বিলাসিতা বেড়ে যায়। মানুষ নিয়মানুবর্তিতা ভুলে গিয়েছিল। যুবসমাজের সামনে দেশপ্রেমের কোন আদর্শ ছিল না। শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ছিল অত্যধিক। প্রদেশগুলি ছিল অবহেলিত। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে রাজকোষে অর্থের টানাটানি পড়ে। নতুন রাজ্যজয় করতে না পারায় বাইরে থেকে অর্থ আসাও বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে রোমের সৈন্যবাহিনীও দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে দুর্ধর্ষ বর্বর জাতিরা রোম আক্রমণ করতে শুরু করে দেয়। দুর্বল শাসকদের পক্ষে সেই সব আক্রমণ ঠেকান সম্ভব হয় নি। ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল ও গলজাতি বারবার আক্রমণ করে রোমসাম্রাজ্যকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ধ্বংস করে।

রোমসাম্রাজ্যের গৌরবের পরিচয়—ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির গৌরবে রোম একদিন পৃথিবীতে উচ্চ মর্যাদার আসন পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে নানা দ্রব্যসম্ভার এসে রোমকে সমৃদ্ধ করে। সুন্দর সুন্দর নগর স্থাপনের মধ্যে এই ঐশ্বর্যের প্রমাণ মেলে। রাজধানী রোমের মাঝখানে গোলাকার ক্রীড়ারঙ্গশালা 'কলোসিয়াম' ছিল স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। এটি সম্রাট ভেসপিসিয়ানের কীর্ত্তি। স্নানাগার, মন্দির, বিজয়স্তম্ভ ও বিজয়তোরণ প্রভৃতি স্থাপত্যকৌশলের পরিচয় দেয়। আইন-কানুন, চিকিৎসা ও হাসপাতালের ব্যবস্থা, সাহিত্য ও ইতিহাসের উন্নতি রোমসভ্যতার গৌরবময় নিদর্শন। ল্যাটিন

সাহিত্যে ভার্জিলের আবির্ভাব অগাষ্টাসের যুগে। তাঁর 'এনিড' কাব্য বিখ্যাত। ঐতিহাসিক 'লিভি' রোমের প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস লিখেছেন

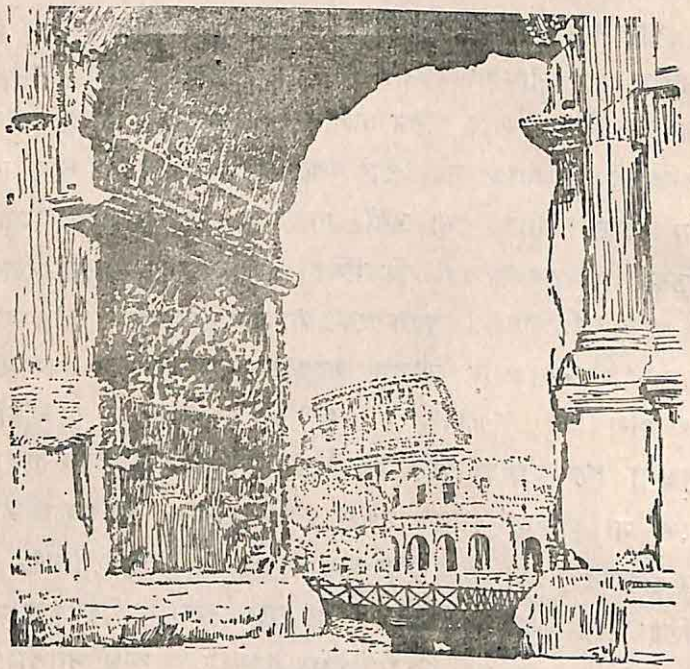

কলোসিয়াম

ভার্জিলেরই যুগে। ভারতবর্ষ সহ বহু দেশের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে জাহাজযোগে অনেক পণ্যদ্রব্য রোমে যেত। তাতে ভারত রোমের প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করত।

খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব ও প্রচার—সম্রাট অগাষ্টাসের আমলে রোমের অধীনে জেরুজালেমের বেথেলহেমে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। তাঁর উদার ধর্মমত প্রাচীন অন্ধবিশ্বাসের মূলে আঘাত দিয়েছিল। সম্রাট টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে মিথ্যা অভিযোগ এনে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশুর শিষ্যদেরকে খ্রীষ্টান বলা হত। পরে তাঁর ধর্মাবলম্বী সকলেই খ্রীষ্টান নামে পরিচিত হতে থাকে। সাধু পল (St. Paul) সর্বপ্রথম যীশুর ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি

তাঁর প্রচারক শিষ্য ছিলেন। তিনি হীব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় বাইবেলের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মূলকথাও ব্যক্ত করেন। যীশু ছিলেন ভক্তিধর্মের প্রবর্তক। গরীব ছুতোরের ছেলে। তিনি প্রচার করলেন যে ঈশ্বর এক, করুণাময় এবং সকল মানুষেরই পিতা। যীশু তাঁর জীবনে ও বাণীতে প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর উপদেশ দিয়াছেন। ক্রুশবিদ্ধ হবার সময়েও অত্যাচারীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। সেই ক্রুশচিহ্নই খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক হয়। এই ধর্মের উদার মত সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। গরীব, ক্রীতদাস ও নিম্নবিত্তের মানুষ এর মধ্যে শান্তি ও সাম্যের খোঁজ পায়। খ্রীষ্টধর্মের শুরুতে ইহুদীরা ছিল রোমের অধীন। রোমের রাষ্ট্রশক্তি খ্রীষ্টানদের সহ্য করতে পারল না। সেখানকার সম্রাটরা দেবতার মত পুজো পেতে চান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে এর স্থান নাই। খ্রীষ্টানরা ধনী ও গরীবের ভেদও ঘুচোতে চায়। তাই খ্রীষ্টানরা রোম-সম্রাটদের কাছে হল রাজদ্রোহী। চলল তাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন। সাধু পলকে তাঁরা মেরে ফেললেন। সম্রাট নিরো অমানুষিক অত্যাচার করেন। তিনি খ্রীষ্টানদেরকে প্রায়ই পুড়িয়ে মারতেন। রোমের এক পাড়ায় আগুন লাগিয়ে তিনি বীণা বাজাতে থাকেন, আর দোষ চাপিয়ে দেন খ্রীষ্টানদের উপর। বন্য পশুর সামনে ফেলে দিয়ে বা মল্লযুদ্ধে খ্রীষ্টানদের বধ করা হত। যীশুর আদেশে খ্রীষ্টানরা দাঁড়িয়ে মার খেত ও প্রাণ দিত। এই অসাধারণ সহিষ্ণুতায় শেষে খ্রীষ্টধর্মেরই জয় হয়। যীশুর জন্মের প্রায় তিনশ' বছর পরে রোমসম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম প্রচারের ভার রাষ্ট্রের উপর দেন। রবিবার বিশ্রামের দিন ঘোষিত হয়। সাধু পিটারের গীর্জা স্থাপিত হয়। ধর্মগুরু হিসাবে পোপের পদও সৃষ্টি হয়। রোমের রাজধানী হয় খ্রীষ্টানদের তীর্থক্ষেত্র। ক্রমে খ্রীষ্টধর্মের মহাশক্তি ইউরোপ ও এশিয়া প্রভৃতি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

১। রোম ও কার্থেজের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধের কারণ কি? এর ফল কি হয়?
২। রোমের ক্রীতদাসের সম্বন্ধে কি জান?
৩। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের অবস্থা বর্ণনা কর।
৪। খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব ও রোমে তাহার প্রচার সম্বন্ধে কি জান?
৫। টীকা লেখ ঃ- জুলিয়াস সিজার, স্পার্টাকাস, হ্যানিবল।

চার চীন রাজবংশের কথা

প্রাচীন চীনের কথা তোমরা শুনেছ। ইয়াংসি-কিয়াং ও হোয়াংহো নদীর তীরে এই সভ্যতার সৃষ্টি। সে বিষয়ে মজার গল্পও দু-একটা বলেছি। এবার আমরা শাঙ্ ও চৌ—এ দুই বড় রাজবংশের আরও কিছু কথা বলব। সে প্রসঙ্গে নামকরা মনীষী কনফিউশিয়াসের কথাও তোমরা শুনতে পাবে।

চীনে সীমান্ত অঞ্চলের যাযাবরদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রায়ই সংঘর্ষ হত। চীন দেশটা খুবই বড়। ছোট ছোট অসংখ্য অঞ্চলে এদেশ বিভক্ত ছিল। সেগুলি ছিল বিভিন্ন রাজার অধীনে। এই রাজারা ছিলেন এক একটা বড় রাজা বা সম্রাটের অধীন। অনেকটা সম্রাটের সামন্তরাজের মত তাঁরা ছিলেন। এই সম্রাট বংশের মধ্যে শাঙ ও চৌ বংশের নাম প্রসিদ্ধ।

শাঙবংশ—১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দ থেকে শাঙবংশের রাজত্বের শুরু। ছয়শ' বছরের ওপর এই বংশ চীনে প্রভুত্ব করে। সম্রাটরা বড় বড় ফৌজ রাখতেন। কারণ চীনের উত্তর অঞ্চল থেকে হূন, তাতার ও মঙ্গোলিয়রা দেশের ওপর বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারা ছিল প্রায়ই অসভ্য বা বর্বর। তারা খুব দুর্ধর্ষ ছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হঠাৎ দলে দলে আক্রমণ করত। তাদের দৌরাত্ম্য এড়াবার জন্য সম্রাটদের শক্ত সৈন্যবাহিনী থাকত। দেশের ভিতরের অশান্তিও যে না ছিল, তা নয়। সামন্ত রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠত। ফলে তাদের সঙ্গেও যুদ্ধবিগ্রহ হত। এমন কি কখন কখন সম্রাটকে হারিয়ে তারাই নিজেরা সম্রাট হয়ে বসত।

শাঙ রাজবংশের আমলে দেশের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজ্যের সীমানা বেড়ে যায়। ব্রঞ্জশিল্পের পাত্রে একটা বিশিষ্টতার পরিচয় মেলে। ক্রমশ দেশের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্যবোধের সূচনা হয়। তবে তাতে ধর্ম-নৈতিক প্রভাবই বেশি ছিল। কারণ সাধারণ প্রজাগণের চোখে সম্রাটরা ছিলেন দেবতার বংশধর। তাঁরা ছিলেন প্রধান পুরোহিত। চীনবাসীর হয়ে তাঁরাই দিতেন দেবতাদের পূজো। পুরানো ঐতিহ্যের

ধারায় চীনাদের মধ্যে একটা বেশ সাধারণ সভ্যতা গড়ে ওঠে। সাধারণ লিপিরও প্রচলন হয়। হূনরা যে তাদের সাধারণ শত্রু—এ বিশ্বাসও তাদের মধ্যে জাগে।

তবে সম্রাটদের অধীনে সামন্তপ্রথার সুবিধা ও অসুবিধা দুটোই ছিল। সামন্তরা পরস্পর ঈর্ষ্যাদ্বেষ নিয়ে থাকত। তাই তাদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তেমন বেগ পেতে হত না। কিন্তু সামন্তদের ক্ষমতালোভ এমন বেড়ে যেত যে তাদেরকে সামলিয়ে ওঠা তাঁদের কষ্টকর হত। সামন্তরাজদের সংখ্যাও তো কম নয়, প্রায় চারপাঁচ হাজার। তাদের মধ্যে কারও কারও প্রতিপত্তিও বাড়তে থাকে। ফলে ছয়শ' বছর পর শাঙবংশের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। শাঙবংশের শেষ সম্রাট বুদ্ধিমান ছিলেন না। তিনি অত্যাচারী ছিলেন। চৌ বংশের উ-ওয়াঙ-এর কাছে তিনি পরাজিত হন এবং আত্মহত্যা করেন।

চৌ রাজবংশ—শাঙ রাজবংশের পতন ঘটান চৌ বংশের উ-ওয়াঙ। তিনি সম্রাট হয়ে পুরাতন সামন্তপ্রথার সংস্কার করেন। তিনি তাঁর অনুচরদের মধ্যেই বেশির ভাগ রাজ্য ভাগ করে দেন। সামন্তদেরকে তিনি উঁচু নীচু—এমন নানা ক্রমে ভাগ করেন। এক এক সামন্তের অধীন জমিদার ঠিক করে জমি বিলির বন্দোবস্ত করেন। জমিদাররা সামন্তের অধীনে চাষবাস করত। তারা প্রায় ভৃত্যের মত সামন্তদের কাজকর্ম করত। সামন্তরা রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে কৃষিবাণিজ্যের খবর দিত। দরকার হলে সম্রাটরা তাদের সাজা দিতেন। সংশোধিত সামন্তপ্রথা চৌ-রাজবংশের ছিল শক্তির উৎস। প্রায় নয়শ' বছর এঁদের প্রভুত্ব বজায় ছিল। শেষের দিকে তাঁদের অবস্থা দুর্বল হয়। হূনরা ক্রমশ উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সামন্তরাজদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সুযোগে সর্বেসর্বা হয়ে পড়েন। কাজেই শীন বংশের আক্রমণে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে চৌ-সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

শীন বংশের সম্রাট শী-ওয়াং তি চৌ-বংশের সম্রাটকে তাড়িয়ে ক্ষমতা দখল করেন। সম্ভবত শীন থেকেই চীন নামের উৎপত্তি। তিনিই

চীন দেশীয় সভ্যতা
গোবি মরুভূমি
তারিম
তারিম উপত্যকা
চীনের মহা প্রাচীর
হোয়াং হো
ইয়াং সিকিয়াং
সিন্ধু
গঙ্গা
১২০০০ ফুটের উপর
৬০০০ ফুটের উপর
৬০০ ফুটের নীচে
জল

স্থাপিত করেন একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। তিনি চীনকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অনেক পাকা রাস্তা ও পথ তৈরী করেন। চীনের প্রাচীর তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি।

চীনের প্রাচীর—চীনের চিরশত্রু হূনদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য শী-ওয়াং-তি এক বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই প্রাচীর পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। প্রাচীরটি ২৪০০ কিলো-মিটার লম্বা, প্রায় দেড় হাজার মাইল। উচ্চতায় ২৫ ফুট, চওড়ায় ১৫ ফুট। ২০০ ফুট অন্তর এক একটি বড় গম্বুজ। প্রাচীরটির ওপর দিয়ে পাশাপাশি চার ঘোড়সওয়ার চলতে পারে।

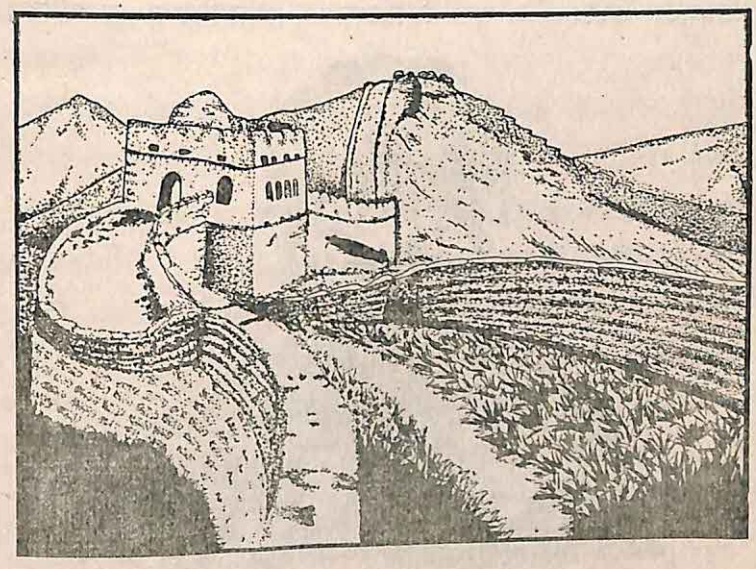

চীনের প্রাচীর

কিন্তু এত বড় প্রাচীর গড়েও শেষ পর্যন্ত হূনদেরকে ঠেকান যায়নি। কারণ যে অংশে প্রাচীর ছিল না, সেইদিক থেকে হূনরা ঢুকে পড়ে। শী-ওয়াং-তি বড় দাম্ভিক ছিলেন। তিনি নিজের কীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় করতে গিয়ে প্রাচীন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করেন। তিনি জ্ঞানচর্চার

বিরোধী ছিলেন। কনফিউশিয়াসের মত মহাজ্ঞানীর উপদেশমূলক বই পুড়িয়ে ফেলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। রাজনৈতিক অখণ্ডতা আনবার চেষ্টায় প্রাচীন ধর্মমত ও ঐতিহ্যকে তিনি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল আশানুরূপ হয় নি। তিনি ধুমকেতুর মত উঠে-ছিলেন এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বংশের শাসন অস্তমিত হয়।

কনফিউশিয়াস—চৌ বংশের রাজত্বকালে চীনের লুপ্রদেশে কনফিউ-শিয়াসের জন্ম হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে। তাঁর যখন সবেমাত্র অল্প বয়স, তখনই তাঁর বাবা মারা যান। তিনি অনেক কষ্টে লেখাপড়া করেন। কিন্তু মাত্র বাইশ বছর বয়সেই তিনি অসাধারণ হয়ে ওঠেন। চরিত্র ছিল উদার মহত্ত্বের প্রতীক। তিনি যুবসমাজকে সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠে নিত্য উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু

কনফিউশিয়াস

প্রচার করেন নি। তাঁর বড়াই ছিল না। বইপত্র তিনি নিজে বিশেষ কিছু লিখতেন না। শিষ্যরা সেই উপদেশগুলি কয়েকটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করে। তবে তিনি সহজ, সরল ও সুন্দর জীবন যাপনের অমূল্য উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন মানুষের নৈতিক জীবন নির্মল

না হলে রাজ্যশাসন শুদ্ধ ও সুন্দর হয় না। তিনি লু প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। নিজের শাসনকার্যে তিনি পবিত্রতার আদর্শ অনুসরণ করতেন। প্রজাদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু তখনকার সম্রাট তাঁর সেই জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলে। মন্ত্রীরা তাতে যোগ দেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কয়েকজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি প্রাচীন শিক্ষাধারাকে বজায় রাখবার উপদেশ দিতেন। নৈতিক আদর্শ ছিল তাঁর উপদেশের মূল কথা। রাজারা কিন্তু তাঁর উপদেশ মানেন নি। তাঁর উপদেশ ছিল অমূল্য, তাতে দার্শনিক জটিলতা নেই। কিন্তু স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। চীন তাঁর কাছে ঋণী। তিনি চীনে এক নতুন আলোর সূচনা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৭ অব্দে তাঁর মৃত্য হয়।

চীন সাম্রাজ্যের পরবর্তী অবস্থা—শী-ওয়াং-তির রাজত্বের শেষে হ্যান-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন চীনের সাম্রাজ্য তিব্বত ও পশ্চিম তুর্কীস্তান পর্যন্ত বেড়ে যায়। হ্যান-বংশের পর ২২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চারশ বছর ট্যান-বংশ রাজত্ব চালায়। এ সময়ে চা উৎপাদন, বন্দুকের বারুদ তৈরি ও কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। চীনাদের মধ্যে ঐক্যবোধ বজায় থাকে ও উন্নতিও দেখা যায়।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। শাঙবংশ সাম্রাজ্যের বিবরণ দাও।

২। চৌবংশ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। চীনা প্রাচীর কেন তৈরি হয়?

২। কনফিউশিয়াস সম্বন্ধে কি জান?

[গ] বস্তুমূখী প্রশ্ন :

১। নিম্নের শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :—

(ক) —চীনের প্রাচীর তৈরি করান।

(খ) কনফিউশিয়াস—প্রদেশে জন্ম নেন।

পাঁচ ।। ভারতবর্ষ ।।

(ক) বৈদিক যুগের সমাজ ও সভ্যতা

সূচনা– প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের স্থান কম নয়। সিন্ধুসভ্যতার কথা তোমরা শুনেছ। এবার ভারতের আর্য সভ্যতার কথা বলব।

অনেকে মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দেড়-দু হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে আসে। তারা গোড়ার দিকে সম্ভবত মধ্য এশিয়ায়, বা পূর্ব অথবা মধ্য ইউরোপে বাস করত। আর্য বলতে প্রাচীন এক ভাষা-ভাষীর গোষ্ঠী বোঝায়। তাদের সেই মূল ভাষা থেকেই সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা হয়েছে, এই সব ভাষার মধ্যে খুবই মিল আছে। সেই আর্য ভাষার লোকেরা ক্রমে ক্রমে ইউরোপে এবং এশিয়ার পারস্যে ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

আর্যদের ভারতে উপস্থিতি– ভারতের উত্তরে বিশাল পর্বত হিমালয়, আর তিন দিকে বিস্তৃত সাগর। বাইরে থেকে ভারত অনেকটা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু উত্তরপশ্চিম সীমান্তের গিরিপথে বাইরের সঙ্গে এর যোগাযোগ অসম্ভব ছিল না।

আর্যদের এক শাখা ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। প্রথমে পাঞ্জাব অঞ্চলে তারা উপস্থিত হয়। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন সিন্ধুর নগরসভ্যতা আর্যরাই ধ্বংস করে। আর্যরা পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে বসতি করে। পরে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলে আর্যরা প্রতিষ্ঠা পায়। প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে ভারতে আর্য সভ্যতার শুরু হয়। এর ওপর অনার্য-সভ্যতারও কিছু প্রভাব পড়ে। অনেক পরিবর্তন ও অনেক লেনদেন সত্ত্বেও আর্য-সভ্যতার মূল প্রভাব আজও ভারতে ওতপ্রোত রয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য—আর্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় পাই বৈদিক সাহিত্যে। বেদ চারিটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋগ্বেদে আছে দেবদেবীর স্তবস্তুতি। সামবেদের মন্ত্র গানের জন্য ব্যবহৃত। যজুর্বেদে আছে যাগযজ্ঞের মন্ত্র। অথর্ববেদ হল যাদুবিদ্যা ও লৌকিক মন্ত্রতন্ত্রের সংকলন। বেদের গদ্যাংশের নাম 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্য। তাতে আছে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ। 'আরণ্যক' 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যের পরিশিষ্ট। সংসারত্যাগী বনবাসীদের জন্য যজ্ঞের বদলে প্রতীক উপাসনার উপদেশ এতে রয়েছে। তার পরেই হল উপনিষদ বা বেদান্ত —বেদের সারভাগ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে কি সত্য আছে, উপনিষদ তার পরিচয় দেয়। 'ব্রহ্ম' নামে এক পরম শক্তিই সেই তত্ত্ব। উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে উপনিষদের মূল্য যথেষ্ট।

সমাজ জীবন—ভারতে এসে আর্যরা প্রথমে নদী-উপত্যকায় বসবাস করে। তারা চাষবাস করে গ্রামসভ্যতা গড়ে তোলে। কৃষি ও পশুপালন ছিল প্রধান উপজীবিকা। কাঠবাঁশ দিয়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করত। পরিবার ছিল সমাজের ভিত্তি। পরিবারের লোকেরা কর্তার অধীন একসঙ্গে বাস করত। স্ত্রী ছিল গৃহের কর্ত্রী। সমাজে নারীদের উচ্চ মর্যাদা ছিল। স্বামীর ধর্মকাজে তারা যোগ দিত। স্ত্রীলোকেও মন্ত্র রচনা করত। এই প্রসঙ্গে ঘোষা ও অপালা প্রভৃতি বিদুষীর নাম করা যায়। উপনিষদের গার্গী ও মৈত্রেয়ী তো খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁরা সভায় শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করতেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। বেশীর ভাগ এক বিবাহেরই প্রচলন ছিল। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে যব, গম, শাকসবজি, ফলমূল, ঘি, দুধ, মধু উল্লেখযোগ্য। পশুর মাংসও তারা খেত। সোমরস বা সুরার প্রচলন ছিল। তারা সূতী ও পশমের কাপড় পরত। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সোনার গহনা পরত। তাঁত, শিল্প ও ধাতুর কাজ তাদের জানা ছিল। সাধারণ লোকের জীবন ছিল সরল ও আড়ম্বরহীন। নাচগান, আমোদপ্রমোদ, পাশাখেলা ও রথের দৌড় এ সবের প্রচলন ছিল।

বৈদিক যুগে গোড়ার দিকে জাতিভেদের কড়াকড়ি ছিল না।

গোষ্ঠী হিসাবে আর্যরা অনার্য থেকে চেহারা ও গায়ের রঙে পৃথক ছিল। আর্যরা ছিল ফর্সা ও লম্বা। অনার্যরা ছিল কালো ও বেঁটে। আর্যরা সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ করতেন ও বেদপাঠ শিক্ষা দিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ বা এক এক অঞ্চলের শাসন করতেন ক্ষত্রিয়রা। কৃষিকাজ, পশুপালন, ব্যবসা বা শিল্পের কাজ করতেন বৈশ্যরা। অনার্যদেরকে আর্যরা দস্যু বলতেন। পরে পরাজিত হয়ে তারা হয় দাস। শেষে চতুর্থ শ্রেণী হিসাবে শূদ্র নামে তারা আর্যসমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। আর্য ও অনার্যের এই মিলনের ফলে দুয়ের সভ্যতার মিশ্রণ হয়েছিল সন্দেহে নাই। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের মধ্যে জাতিভেদ শেষের দিকে প্রকাশ পায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা—আর্যরা প্রধানত পশুপালন ও কৃষিকাজ করত। গরু ভেড়া ছাগল মোষ ও ঘোড়া তারা পুষত। ক্রমে তাদের মধ্যে নানা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। ছুতোর, কামার, স্যাকরা, তাঁতী ও চামার—এমন নানা পেশায় লোক কাজ করত। তখনকার দিনে ব্যবসাতে বিনিময় প্রথা চালু ছিল। গরুর দামই ছিল মূল্যমান। ব্যবসা চলত স্থল ও জল—এই দুই পথেই। নৌকো তৈরির ব্যবস্থা ছিল। লোহার ব্যবহার আজানা ছিল না। এযুগের শেষের দিকে কোথাও কোথাও নগরও গড়ে ওঠে।

বৈদিক যুগের ধর্ম—প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও শক্তি ঋষিদের মনে আনন্দ, ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করত। ঋগ্বেদের মন্ত্রে তারই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। প্রকৃতির শক্তিগুলিকে তাঁরা দেবতা রূপে কল্পনা করতেন। বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বায়ুর দেবতা মরুৎ, আকাশ ও জলের দেবতা বরুণ, তেজের দেবতা অগ্নি, আলোর দেবতা সূর্য—এমন কত দেবতার পরিচয় পাই। স্ত্রী-দেবতার মধ্যে সরস্বতী ও ঊষা উল্লেখ-যোগ্য। সূর্যকিরণে জড়ান ঊষার কি সুন্দর দিব্য রূপ! দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ ছিল ধর্মের প্রধান অঙ্গ। ফলে যাজক বা পুরোহিত শ্রেণীরা প্রধান প্রতিষ্ঠা পায়। সকল দেবতা যে একই ঈশ্বরের বিভিন্ন

প্রকাশ, বেদে সে কথাও আছে। যজ্ঞের প্রভাবে মানুষের মনে কর্মফলে বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

রাজনৈতিক জীবন—তখনকার দিনে প্রধানত ছিল গ্রামসভ্যতা। গ্রাম শাসনের কর্তাকে বলা হত 'গ্রামণী'। কতকগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত হত 'বিশ্' সংস্থা। বিশ্‌পতি ছিল তার প্রধান। জনসংস্থাও ছিল। এক এক অঞ্চলে রাজা বা রাজন্য রাষ্ট্র চালাত। যুদ্ধেও তারা নেতৃত্ব দিত। সাধারণত রাজার ছেলেই রাজা হত। দরকার বুঝলে জনগণও রাজবংশের মধ্য থেকে বেছে কাউকে রাজা নির্বাচিত করত।

বিভিন্ন আঞ্চলিক ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হত। যুদ্ধে দুর্বল রাজারা প্রবল রাজাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হত। এইভাবে রাজ্যের সীমা ও ক্ষমতা বেড়ে যেত। একচ্ছত্র ক্ষমতা হস্তগত করে কেউ সম্রাট হয়ে বসতেন। এই প্রসঙ্গে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলা যায়। যেসব রাজা অশ্বমেধের ঘোড়া ধরত, তাদেরকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী রাজা সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করতেন।

ক্রমে 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুই পরিষদ গড়ে ওঠে। রাজা সেই সভা ও সমিতির পরামর্শ নিতেন। পুরোহিত রাজ্যব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। পুরোহিতই প্রায় মন্ত্রী হত। রাজার অধীনে সেনাবল, দূত ও অন্যান্য কর্মচারীরা থাকত। রাজার অভিষেক মন্ত্র থেকে বোঝা যায় প্রজার সন্তোষ বিধানই ছিল রাজাদের প্রধান কর্তব্য।

বৈদিক সভ্যতার শেষের দিকে কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, কোশল ও বিদেহ—এমন এক একটা বড় শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন হয়। রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির ফলে কালে এক একটা বড় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

(খ) রামায়ণ ও মহাভারত

সূচনা—রামায়ণ ও মহাভারতের কথা তোমরা অবশ্যই শুনেছ। এই দুই মহাকাব্যের খ্যাতি প্রায় সর্বত্র। আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে এদের প্রভাবের কথা বলে শেষ করা যায় না। বাস্তবিক রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য। আর মহাভারত হল একাধারে কাব্য, ইতিহাস

ও ধর্মশাস্ত্র। বলা হয়—'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।' রামায়ণ বাল্মীকির রচনা, আর মহাভারত ব্যাসদেবের রচনা।

রামায়ণের কথা—প্রাচীন সূর্যবংশের কাহিনীপ্রসঙ্গে রামচন্দ্রের চরিতকথা রামায়ণের আলোচ্য বিষয়। অযোধ্যার রাজা দশরথ তাঁর পুত্র রামচন্দ্রকে রাজপদে বসাতে চান। কিন্তু বাদ সাধেন রাজার মেঝ রানী কৈকেয়ী। তিনি রাজার কাছ থেকে বর আদায় করেন—যার ফলে তাঁর ছেলে ভরতের জন্য রাজত্ব ও রামের চৌদ্দ বছর বনবাসের ব্যবস্থা হয়। রাম বনে যান, সঙ্গে যান তাঁর স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ। সেখানে আর এক বিপদ ঘটে। দণ্ডকারণ্য থেকে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করে। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। তাঁর বানরসৈন্য নিয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে যুদ্ধে নিহত করেন এবং সীতাকে উদ্ধার করেন। অযোধ্যায় ফিরলে প্রজাদের কথায় সীতাকে তিনি বনবাসে পাঠান। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, প্রজাহিতে কর্তব্যনিষ্ঠা, সীতার পতিভক্তি ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি এগুলি সত্যই আদর্শস্বরূপ।

সভ্যতার বিবরণ—রামায়ণে তিনটি সভ্যতার কথা জানা যায়। আর্যাবর্তের আর্যসভ্যতা, কিস্কিন্ধ্যার বানরসভ্যতা ও লঙ্কার রাক্ষসসভ্যতা। রাক্ষসসভ্যতার সমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ক্ষত্রিয় রাজাদের বিরুদ্ধে পরশুরামের অভিযান থেকে মনে হয় তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কোথাও কোথাও ক্ষমতার লড়াই চলছিল। রামায়ণে পাটলিপুত্রের কোন উল্লেখ নেই। দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠার কোন ইঙ্গিত নেই। তবে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির উচ্চাদর্শের পরিচয় রামায়ণে আছে।

মহাভারতের কথা—কুরুবংশে জন্ম নেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তাই পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশ' পুত্র ছিল। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এই পাঁচ পুত্র। পাণ্ডবদের কৌরবরা ঈর্ষ্যা করত। কৌরবরা পাশা খেলায় তাদেরকে হারিয়ে দিয়ে বনবাসে যেতে বাধ্য করায়। বনবাসের পর ফিরে এসে পাণ্ডবরা রাজ্যের ন্যায্য ভাগ চায়। কিন্তু গর্বিত দুর্যোধন অস্বীকার করে। ফলে কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ হয়। সে

যুদ্ধে কৌরবরা বিনষ্ট হয়। সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের রাজারা কোন না কোন পক্ষে যোগ দেন। তখন দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে। দক্ষিণাপথের রাজারাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

মহাভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি—মহাভারতের সময়ে সামাজিক অবস্থার যেমন উন্নতি হয়েছিল, জটিলতাও তেমনি নানারূপ প্রকাশ পেয়েছিল। শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিকিৎসা, জ্ঞান, বিজ্ঞান. ধর্ম ও দর্শনে নানা উচ্চ চিন্তার পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণ, ও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম-ব্যবস্থা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। মূর্তিপূজা ও অবতার-বাদ প্রতিষ্ঠা পায়। ইন্দ্র গণ্য হন স্বর্গের দেবতাগণের রাজা হিসাবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রিমূর্তি প্রাধান্য পায়। গণেশ, পার্বতী প্রভৃতি নূতন দেবতারও আবির্ভাব ঘটে। পুনর্জন্মে বিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গীতার উপদেশে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রশক্তিগুলিকে একত্রিত করে শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড ভারতবোধ গড়ে তুলতে চান। সমাজব্যবস্থা ও আইনকানুন সম্বন্ধে যে সব কথা জানা যায়, মনুর ধর্মশাস্ত্রেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। মোট কথা মহাভারত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার। গ্রীসের কাছে ইলিয়াড ও ওডেসির যে প্রভাব, তার চাইতেও রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব আমাদের কাছে অনেক বেশী।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১ ভারতের প্রথম সমাজজীবনের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

২। বৈদিক যুগে আর্যদের ধর্মজীবন কেমন ছিল ?

৩। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে ভারত-সভ্যতার কি পরিচয় পাও ?

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বেদ কয় প্রকার ? কি কি ? তাদের আলোচ্য বিষয় কি ?

২। বেদের যুগে রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?

৩। বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও।

৪। রামায়ণের গল্পটি লেখ।

৫। মহাভারতের বৈশিষ্ট্য কি?

(গ) বস্তুধর্মী প্রশ্ন :

১। নিম্নের উক্তিগুলি ভুল না ঠিক বল :

(ক) আর্য সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা। (খ) বেদের এক নাম উপনিষদ। (গ) রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি। (ঘ) 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যে যাগযজ্ঞের কথাই বেশি। (ঙ) বৈদিক যুগে আর্যরা লোহার ব্যবহার জানত না।

২। (ক) থেকে (চ) পর্যন্ত বাম পাশে কতকগুলো ও ডান পাশে কতকগুলো শব্দ দেওয়া আছে। যার সঙ্গে যার সম্পর্ক সেই মত শব্দগুলিকে সাজাও।

(ক) গার্গী	সভ্যতা	(ঘ) অশ্বমেধ	বিদুষী
(খ) বেদ	যজ্ঞ	(ঙ) লক্ষ্মণ	জন্মান্ধ
(গ) গ্রামীণ	চারটি	(চ) ধৃতরাষ্ট্র	ভ্রাতৃভক্ত

(গ) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

সূচনা—বৈদিক যুগের শেষভাগে সমাজে ও ধর্মে কিছু জটিলতা দেখা যায়। জাতিভেদের কঠোরতা প্রকাশ পায়। মগধ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দের প্রধান্যের দাবী ওঠে। ধর্মের আন্তরিকতার বদলে প্রাণহীন শুষ্ক অনুষ্ঠানই বড় হয়ে ওঠে। যজ্ঞে পশুবধ বা জীবহিংসার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগে। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন অন্দোলন হয়। সেই অবস্থার মধ্যেই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। দুই ধর্মেরই প্রবর্তক ছিলেন দুই রাজকুমার।

জৈন ধর্ম—মহাবীর ছিলেন জৈনধর্মের প্রবর্তক। তাঁর পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান। বৈশালীর লিচ্ছবি বংশে তাঁর জন্ম। তিনি ত্রিশ বছর বয়সে তপস্যা শুরু করেন। তাঁর পর তিনি নতুন প্রেরণা পান। তাঁর মতে অহিংসাই সবচেয়ে বড় ধর্ম। সৎজীবন যাপনের জন্য সৎচিন্তা, সৎজ্ঞান ও সৎকর্মের উপদেশ তিনি দিয়েছেন।

তখন থেকে তিনি মহাবীর জিন—এই নামে খ্যাত হন। 'জিন' শব্দের অর্থ জয়ী। তিনি ব্রতনিয়মের দ্বারা সব কিছু জয় করেছিলেন। জৈন সম্প্রদায়ের মতে তিনি সর্বশেষ তীর্থংকর। জগতের দুঃখ থেকে যারা মুক্তির পথ দেখান, তাঁরা হলেন তীর্থংকর। পার্শ্বনাথ ছিলেন তাঁর আগে ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর। পার্শ্বনাথের উপদেশ ছিল চারটি—অহিংসা, সত্য-বাদিতা, চুরি না করা ও লোভ ত্যাগ করা। মহাবীর তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের নীতি যোগ করেন। এই পাঁচটি ধর্মনীতিকে 'পঞ্চ মহাব্রত' বলে। অহিংসা ও সদাচারের উপর এই ধর্মে খুবই জোর দেওয়া হয়েছে। জৈন ধর্ম বেদকে ধর্মের অকাট্য প্রমাণ বলে মানে না। জৈনরা যাগযজ্ঞ বিশ্বাস করে না, তবে কর্মফল বা জন্মান্তরবাদে তারা বিশ্বাসী। মহাবীর ত্রিশ বছর মগধ, নালন্দা, কোশল প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। ৭২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাবীর জীন

গৌতম বুদ্ধ ঃ বৌদ্ধ ধর্ম—মহাবীরের প্রায় সমকালে গৌতমের জন্ম হয়। ৫৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নেপালের সীমান্তে কপিলাবস্তু নগরে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যে নাম ছিল সিদ্ধার্থ। পিতা শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোদন। ষোল বা উনিশ বছর বয়সে গোপা বা যশোধরার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ২৯ বছর বয়সে রাহুল নামে তাঁর পুত্র হয়। একদিন সারথির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে। পরে দেখলেন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ ও আর একটি শবদেহ। মানুষ মাত্রেরই এই পরিণাম

—সারথি তাঁকে এই কথাই বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি কিসে হয়—তারই সন্ধানে তিনি সংসার ছাড়লেন। অনেক তপস্যার পর গয়ার কাছে গেলেন। সেখানে এক বটগাছের তলায় ধ্যানে বসলেন। তিনি বোধি লাভ করলেন। সেই বটগাছকে বলা হয় বোধিবৃক্ষ। তখন থেকে সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ।

গৌতম বুদ্ধ

তাঁর মতে সুখের বাসনা ও লোভই দুঃখের মূল। অহিংসা তাঁর ধর্মের সার কথা। তিনি লোভ বা বাসনা দূর করার জন্য আটটি উপায়ের কথা বলেছেন—সৎবাক্য, সৎকর্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি। তাঁর উপদেশ পালি ভাষায় প্রচারিত হয়েছে। সাধারণের বোঝবার সুবিধের জন্যই এই ব্যবস্থা। তিনি কাশীর কাছে সারনাথে তাঁর উপদেশ প্রচার করেন। মানুষ মাত্রে সকলেই সমান। ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, উহা শুধু ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান নয়। অহিংসা, সংযম ও সৎজীবন—বৌদ্ধধর্মের এগুলিই মূল কথা। তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশগুলিকে 'ত্রিপিটক' নামক গ্রন্থে সংগ্রহ করেন। তাঁর ধর্মের উচ্চাদর্শে জনসাধারণ এবং রাজারাও প্রভাবিত হন। তাঁর সরল অথচ উচ্চ ধর্মমত ক্রমে লঙ্কা, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি নানা অঞ্চলে প্রসারিত হয়।

অনুশীলনী

(ক) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মহাবীরের জীবনী ও তাঁর ধর্মের পরিচয় দাও।

২। বুদ্ধদেবের জীবনী ও তাঁর ধর্মের সারমর্ম বল।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মহাবীরের ধর্মের নাম জৈন ধর্ম হল কেন ?

২। গৌতম বুদ্ধের আদি নাম কি ? তিনি কেন বুদ্ধ নামে পরিচিত হন ?

(গ) বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

নিম্নের প্রশ্নগুলির পাশে দুটি করে উত্তর দেওয়া আছে। কোন্‌টি ঠিক উত্তর বল ঃ

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) জৈন ধর্মের প্রবর্তক কে ?	গৌতম, মহাবীর
(খ) বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা কি ?	ব্রহ্মচর্য, অহিংসা
(গ) শুদ্ধোদনের রাজধানী কি ?	নেপাল, কপিলাবস্তু
(ঘ) গোপা কার স্ত্রী ছিলেন ?	সিদ্ধার্থের, মহাবীরের
(ঙ) বোধিবৃক্ষ কোথায় অবস্থিত ?	গয়ায়, সারনাথে

(ঘ) সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত—খ্রীষ্টপূর্ব ছয়শ' অব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। বেদের শেষের দিকেই কয়েকটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় সেকথা আমরা বলেছি। মগধের রাজা বিম্বিসার অঙ্গদেশ এবং তাঁর পুত্র অজাতশত্রু কোশল জয় করেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষে নন্দবংশের রাজা মহাপদ্ম মগধের সিংহাসন দখল করেন। তিনি গোদাবরী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু নন্দবংশের শেষ রাজার প্রতি পণ্ডিত চাণক্য অসন্তুষ্ট হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে দিয়ে নন্দবংশ ধ্বংস করান। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর মা মুরার নামে মৌর্যবংশ স্থাপিত করেন। কেউ কেউ বলেন সে কালে মৌর্য নামে এক প্রাচীন রাজবংশ ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে এসে পাঞ্জাব

থেকে ফিরে যান। পরে তাঁর সেনাপতি সেলুকস পাঞ্জাব দখল করতে এসেই চন্দ্রগুপ্তের কাছে হেরে যান। সন্ধির শর্ত হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব পান। সেলুকস কাবুল কান্দাহার ও হীরাট চন্দ্রগুপ্তকে উপহার দেন। মেগাস্থিনিস তাঁর রাজধানীতে গ্রীক দূত হিসেবে নিযুক্ত হন। চন্দ্রগুপ্ত উত্তরে এবং বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণেও মহীশূর পর্যন্ত রাজ্য দখল করেন। তাঁর যুদ্ধের দক্ষতা ও শাসনক্ষমতা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর আমলে হাতী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চতুরঙ্গ সৈন্যবল ও গুপ্তচরবৃত্তি ছিল। রাস্তাঘাট তৈরি প্রভৃতি কল্যাণকাজ তিনি যথেষ্ট করেছেন। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা ও কৌটিল্য বা চাণক্যের অর্থশাস্ত্র থেকে তাঁর রাজ্যশাসন নীতির কথা জানা যায়। বৃদ্ধবয়সে তিনি জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মহীশূরে মারা যান।

সম্রাট অশোক—চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার, পরে বিন্দুসারের পুত্র অশোক সিংহাসনে বসেন। অশোক প্রথম জীবনে অত্যাচারী ছিলেন। লোকে তাঁকে চণ্ডাশোক বলত। কলিঙ্গ জয়ে তিনি এক রক্তাক্ত যুদ্ধ করেন। প্রায় এক লক্ষ সৈন্য মারা যায়। সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে তাঁর মন ক্ষুব্ধ হয়। তিনি যুদ্ধজয়ের নীতি ছেড়ে দিয়ে অহিংসা ব্রত গ্রহণ করেন। উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে বৌদ্ধ ধর্ম নেন। তিনি যুদ্ধের ভেরীঘোষের বদলে ধর্মঘোষ আশ্রয় করেন। সাধারণের উপকারের জন্য রাস্তা, কুয়ো, হাসপাতাল, বিশ্রাম-ঘর—এমন কত কি তৈরি করান। জনকল্যাণ ছিল তাঁর শাসনের

সম্রাট অশোক

আদর্শ। প্রজাদেরকে তিনি পুত্রের মত ভাল বাসতেন। জীব-মাত্রের প্রতি দয়ার জন্য তিনি পশুবলি ও শিকার বন্ধ করেন। রাজ্যের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে ও শিলাস্তম্ভে বৌদ্ধধর্মের বাণী ও উপদেশ খোদাই করে প্রচার করেছেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিশাল ছিল। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সম্রাট।

অশোকের ধর্মনীতি—অশোকের ধর্মনীতিকে 'ধম্ম' বলা হয়। সেই নীতির মূল কথা হল—(১) পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, (২) সকল ধর্মে সহিষ্ণুতা, (৩) গুরুজনের আদেশ পালন, (৪) ছোটদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া, এবং (৫) অহিংসা। তিনি ধর্ম-উপদেশের জন্য 'মহামাত্র' পদ সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য মঠ তৈরি করেন। তিনি বহির্ভারতেও ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠান। তিনি শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। সেই প্রচারের ফলে এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

ব্রাহ্মী লিপি—তাঁর আমলে সারনাথের অশোক স্তম্ভ, বরহুত ও সাঁচির 'বুদ্ধস্তূপ' শিল্পকীর্ত্তির উচ্চ নিদর্শন। সম্রাট অশোকের শিলা-লিপিতে বেশির ভাগ ব্রাহ্মী লিপিই ব্যবহার হত। অনেকে মনে

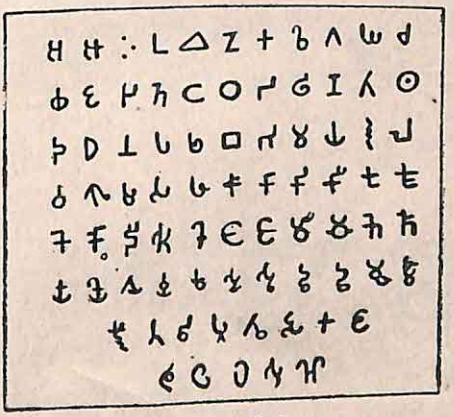

ব্রাহ্মীলিপি

করেন এই লিপি ফিনিসীয়দের কাছ থেকে ভারতবর্ষে আসে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে। মহেন-জো-দরোর লিপি বাদে আর এক লিপির নাম **খরোষ্ঠী**—ডান দিক থেকে তাতে বাঁদিকে লেখা হত।

অশোকের সাম্রাজ্য—অশোকের সময় পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। আফগানিস্তানের কিছু অংশ, হিন্দুকুশ ও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। পূর্ব সীমান্তের কামরূপ ও দক্ষিণ প্রান্তের তামিল অঞ্চল, চোল, কেরল ও পাণ্ড্য ছাড়া প্রায় গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন—অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও পৌত্র কিছুকাল রাজত্ব করেন। তবে তাঁদের যোগ্যতা তেমন ছিল না।

পরে ৩৭ বছরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র সিংহাসন দখল করে শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঙ) কুষাণ সাম্রাজ্য

সূচনা—মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যগুলি মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। উত্তরপশ্চিম সীমান্তে ও পাঞ্জাবে বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হয়। ব্যাকট্রিয়, গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণরা দলে দলে হামলা করতে থাকে। এদের মধ্যে কুষাণরা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এরা ইউ-চি জাতির এক শাখা। প্রাচীন কালে চীনে বাস করত। হূনরা এদেরকে তাড়িয়ে দেয়। কুষাণরা প্রথমে তক্ষশিলায় বসতি করে। পরে পেশোয়ার থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্য জয় করে এবং ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক—কণিষ্ক কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। রাজ্য বিস্তারে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। তিনি মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমি পর্যন্ত অনেক দেশ তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। অশোকের পর তিনিই দ্বিতীয় শক্তিশালী সম্রাট। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং তখন থেকে শকাব্দ শুরু করেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পের-মিশ্রণে তিনি গান্ধারশিল্পের সৃষ্টি করেন। মথুরায় কণিষ্কের এক ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

কণিষ্কের ভগ্ন মূর্তি

কণিষ্কের সভায় ছিলেন 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের লেখক অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুমিত্র ও বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের রচয়িতা চরক। চীন ও এশিয়ার সঙ্গে তাঁর সময়ে বাণিজ্য ও রাজনীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়। খ্রীঃ তৃতীয় শতকে এর পতন হয়।

(চ) গুপ্ত সাম্রাজ্য

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত—শ্রীগুপ্ত কুষাণ রাজবংশের অধীনে কাজ করতেন। কুষাণ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি মগধে স্বাধীন সাম্রাজ্যের এক রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে বসেন। তখন থেকেই গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয়। তিনি লিচ্ছবি রাজার মেয়ে কুমারদেবীকে বিয়ে করেন। ফলে লিচ্ছবি রাজ্য তাঁর অধীনে আসে। তিনি বিহার, বাংলা ও উত্তর প্রদেশ তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন।

সমুদ্রগুপ্ত—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর সভাকবি হরিষেণ এলাহাবাদ শিলালিপিতে তাঁর প্রশস্তি করেছেন। তাতে তাঁর বিভিন্ন রাজ্যজয়ের বর্ণনা আছে। তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজাদেরকেও হারিয়ে দেন। তবে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অত দূর থেকে দক্ষিণ ভারত শাসন করা তখনকার দিনে সহজ ছিল না। তাঁকে ভারতের নেপোলিয়ান বলা হয়। তিনি হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। নিজে বিদ্বান ও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর মুদ্রার ছাপে তাঁকে বীণা বাজাতে দেখা যায়।

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিক্রমাদিত্যের নামডাক খুবই বেশি। নামটি উপাধির সামিল। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়ে রাজত্ব করেন। তিনি শকদের হারিয়ে দিয়ে শকারি উপাধি পান। উজ্জয়িনীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সভায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণীরা সব বিরাজ করতেন। তাঁর

নবরত্নের সভায় শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন মহাকবি কালিদাস। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মালব প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত, তারপর স্কন্দগুপ্ত রাজত্ব করেন। স্কন্দগুপ্ত হূন আক্রমণ রোধ করেন।

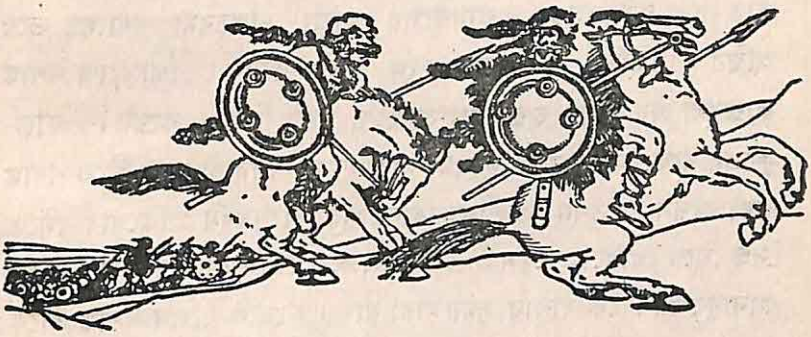

হূন আক্রমণ

গুপ্তযুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলা হয়। তখন জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে ও চিত্রকলায় অসামান্য সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সারনাথের বুদ্ধমূর্তি, অজন্তা গুহার চিত্র—এসব খুবই উন্নত শিল্পের পরিচয় দেয়। বহির্ভারতের সঙ্গেও এসময় যোগাযোগ ছিল। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বিবরণ থেকে তা জানা যায়। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর দুর্বল বংশধররা সাম্রাজ্য রাখতে পারেনি। বিরোধ, বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণও গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

(ছ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষে প্রাচীন বাংলা

বাংলার সম্রাট শশাঙ্ক—গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষের দিকে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজপরিবারে কলহ, অধীনস্থ শাসকদের বিদ্রোহ ও বিদেশীয়দের আক্রমণ সব প্রায় এক সঙ্গেই ঘটে। বাংলা তখন দুই অংশে দুই নামে পরিচিত ছিল। উত্তর ও পশ্চিমের কিছু অংশ ছিল গৌড়, আর বাকী অংশ ছিল বঙ্গ। শশাঙ্ক নামে এক সাহসী বীর গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। মুর্শিদাবাদের কাছে কর্ণ-সুবর্ণে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ

নিয়ে তিনি বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মগধ জয় করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধূমকেতুর মত উঠেছিলেন। তাঁর পূর্ব পরিচয় অজ্ঞাত।

তখন কান্যকুব্জে ছিলেন মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মা। তিনি থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিয়ে করেন। ফলে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের ভয়ে অস্থির। তিনিও থানেশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। গৌড়রাজ শশাঙ্ক কান্যকুব্জ জয় করার জন্য মালবরাজের সঙ্গে মিত্রতা করেন। কান্য-কুব্জের যুদ্ধে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা মারা যান। তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রীকে শশাঙ্ক বন্দী করেন। তখন প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন প্রতিশোধ নিতে সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। মালবরাজকে তিনি হারিয়ে দেন। কিন্তু কান্যকুব্জের দিকে যাবার সময় মারা যান। অনেকে বলেন শশাঙ্ক তাঁকে হত্যা করেন।

রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি শশাঙ্কের কিছু করতে পারেন নি। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক বাংলা ও উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য হস্তগত করেন। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। পরে বাংলায় পালসাম্রজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সে আরও দেড়শ' বছর পরে।

অনুশীলনী

(ক) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। সম্রাট অশোকের রাজত্বের এবং রাজ্যশাসন-নীতির পরিচয় দাও।

২। অশোকের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে কি জান ?

৩। কুষাণ সাম্রাজ্যের কথা যা জান বল।

৪। সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। গুপ্তযুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলা হয় কেন ?

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কণিষ্ক কে ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে কিরূপ উন্নতি হয় ?

৩। গুপ্ত সাম্রাজের পতনের কারণ কি ?

৪। টীকা লিখ—কৌটিল্য, মৌর্য, শশাঙ্ক।

(গ) বিষয়মূখী প্রশ্ন :

১। বন্ধনীর মধ্যে লেখা কোন উত্তরটি ঠিক ?

(ক) অশোক বাহুবলে জয় করেন (সিংহল, কলিঙ্গ)।

(খ) ভারতের নেপোলিয়ন হলেন (কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত)।

(গ) শকারি উপাধি গ্রহণ করেন (চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক)।

(ঘ) অর্থশাস্ত্র রচনা করেন (কৌটিল্য, নাগার্জুন)।

২। ভুল শুদ্ধ কর :

(ক) কালিদাস ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি।

(খ) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কনৌজ।

(গ) গান্ধার শিল্প সৃষ্টি করেন স্কন্দগুপ্ত।

(ঘ) কলিঙ্গ যুদ্ধ করেন কুমারগুপ্ত।

(ঙ) অজন্তার চিত্রশিল্প কুমারগুপ্তের সময়ের নিদর্শন।

(চ) গ্রহবর্মার স্ত্রীর নাম কুমারদেবী।

(জ) বহির্ভারতে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ

ব্যবসার যোগাযোগ—প্রাচীন কাল থেকেই বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আছে। সিন্ধুসভ্যতার যুগে ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে মেসোপটেমিয়া, আরব, ফিনিশিয়া, এমন কি মিশরের সঙ্গে জল ও স্থলপথে ব্যবসাবাণিজ্য চলত। গ্রীক নাবিকের এক বিবরণে ভারতের প্রথম শতাব্দীর বন্দরগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। তখন ভারত থেকে মসলাপাতি, ওষুধের গাছগাছড়া, চামড়া, মণিমুক্তা ও হাতীর দাঁত চালান যেত। এক রোম থেকেই ভারত বছরে ৫০ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা পেত। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য রাজা রোমের সম্রাট অগষ্টাসের সভায় দূত পঠিয়েছিলেন।

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক—মধ্য এশিয়ার সঙ্গে প্রথম যে যোগাযোগ হয়, তাতে ব্যবসাবাণিজ্যের লেনদেনই ছিল প্রধান। কিন্তু এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারসূত্রেও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুষাণরা প্রথমে মধ্য এশিয়ায় ছিল। ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। কুষাণসম্রাট খোটন, কাশগড় ও ইয়ারকন্দ—বর্তমানে যেটা তুর্কিস্তান—সেই সব অঞ্চল দখল করেন। তিনি সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের এক কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এর প্রভাবে কাস্পিয়ান সাগর থেকে চীন পর্যন্ত ভারতীয় উপনিবেশ গঠিত হয়। খোটনের 'গোমতী'-বিহার বৌদ্ধধর্মের বড় কেন্দ্র। সেখানকার শিল্পে ও সাহিত্যে ভারতীয় প্রভাব আছে। মধ্য এশিয়ার কুচীরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপি প্রচলিত হয়। মধ্য এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে বৌদ্ধস্তূপ, শিলালিপি ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্রশিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। চীনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসার সম্পর্ক প্রথম শতাব্দী থেকে। চীন থেকেই বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় যায়, সেখান থেকে জাপানে। ব্রহ্মের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক অনেক দিনের। মাদ্রাজ উপকূল বা বাংলার তাম্রলিপ্ত দিয়ে ইন্দোচীন, মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও—এদের সঙ্গেও ভারতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয়। ভারতীয় রাজারাও সে সব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেসব স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা চিহ্ন আজও সুস্পষ্ট রয়েছে।

অনুশীলনী

(ক) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের পরিচয় দাও।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বহির্ভারতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের ফল কি ?

(গ) বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। বন্ধনীর মধ্যে যে শব্দগুলি আছে, বাঁপাশের উক্তির সঙ্গে তার কোন্‌টি ঠিক বলে মনে কর, তাতে টিক চিহ্ন দাও।

(ক) মধ্য এশিয়ার ভারতের উপনিবেশ গড়ে তোলেন (অশোক, কণিষ্ক)।

(খ) যেখান থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে যায় তার নাম (চীন, কোরিয়া)।

(ঝ) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

ভারতের ইতিহাস বহু প্রাচীন। নানা সূত্র থেকে ঐতিহাসিকরা এর উপাদান যোগাড় করেছেন। তার মধ্যে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণের মূল্য যথেষ্ট।

মেগাস্থিনিস—মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস গ্রীক দূত ছিলেন। তিনি তখনকার এই দেশ সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ লেখেন। সে বিবরণের নাম ইণ্ডিকা। তা থেকে জানা যায় মৌর্য রাজারা মন্ত্রীদের সাহায্য নিয়ে রাজকার্য চালাতেন। গুপ্তচররা গোপন খবর যোগাড় করত। নারীরক্ষীরা রাজার অন্দরমহলে পাহারা দিত। যুদ্ধ, মৃগয়া বা বিচার উপলক্ষ্যে রাজা বাইরে আসতেন। অন্য সময় রাজপ্রাসাদেই থাকতেন। রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে। শহরটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দশ মাইল, প্রস্থ পৌনে দু মাইল। পরিখা ও পাঁচিল দিয়ে শহরটি সুরক্ষিত ছিল। সে আমলে সাধারণ মানুষ সুখেই ছিল। তখন ভারতে শিল্পোন্নতিও হয়েছিল। তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনী ছিল নামজাদা শহর। ভারতবাসীরা সত্যবাদী, সরল ও শান্তিপ্রিয় ছিল। সমাজে চুরি-ডাকাতি ছিল না।

ফা-হিয়েন—চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় ভারতে আসেন। ভারতকে তিনি পবিত্র দেশ ভাবতেন। বিদেশ থেকে নানা ছাত্র পাটলিপুত্রে পড়তে আসত। তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। দেশে চুরি-ডাকাতি আদৌ ছিল না। গৃহস্থ রাত্রিতে নির্ভয়ে দরজা খুলে ঘুমোতে পারত। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ ছিল কর। যোগ্যতার ভিত্তিতে রাজকর্মচারী নিযুক্ত হত। মানুষ সৎ ও সরল জীবন যাপন করত। জাতিভেদ প্রথা ছিল এবং নীচ জাতের লোক শহরের বাইরে বাস করত। গুপ্ত সম্রাটরা উদার ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির দিকে তাঁদের খুবই নজর ছিল। তাম্রলিপ্ত সেযুগের বিখ্যাত বন্দর ছিল। সেখান থেকে

বাঙালী বণিকরা সিংহল ও যবদ্বীপ ইত্যাদিতে ব্যবসা করতে যেত। ফা হিয়েন নিজেও কিছুদিন তাম্রলিপ্তে ছিলেন।

(ঞ) প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি

সূচনা—কোন দেশের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে শিক্ষা, সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতিতে তার যথার্থ পরিচয় মেলে। বৈদিক সভ্যতার পর প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত—এই তিন সাম্রাজ্যেরই বেশ কিছু অবদান আছে। বিদেশী পর্যটকরাও সে কথা বলেছেন।

মৌর্যযুগ—মৌর্যযুগে শিল্প ও স্থাপত্য কলার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপটি অশোক তৈরি করেন। তাঁর নির্মিত বহু স্তম্ভ।

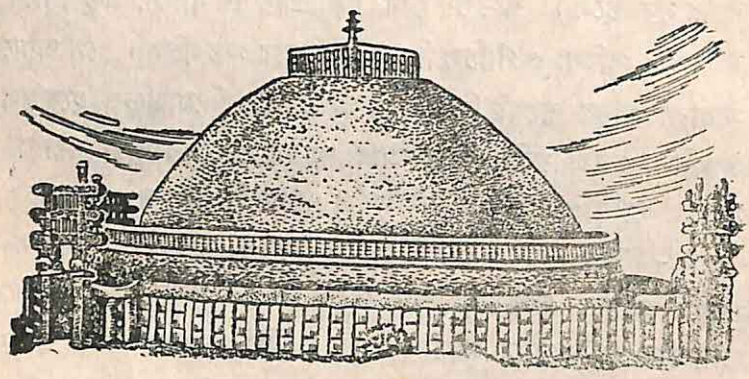

সাঁচী স্তূপ

সারনাথের স্তম্ভের গায়ে খোদিত সিংহমূর্তিটি বড়ই সুন্দর। মৌর্য স্থাপত্য ও শিল্পে পারসিক ও গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রশাসন নীতির অমূল্য গ্রন্থ।

কুষাণযুগ—কুষাণযুগে শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার হয়। কণিষ্ক বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ করেন। তিনি ভারতে ও মধ্য এশিয়াতে বুদ্ধের বাণী ও ধর্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক চৈত্য তৈরি করেন। গ্রীকদেবতাদের অনুকরণে তিনি বুদ্ধমূর্তি তৈরি

করান। গ্রীক, রোম ও ভারতীয় রীতির মিশ্রণে তিনি স্থাপত্যে গান্ধারশিল্পের সৃষ্টি করেন। মথুরা তক্ষশিলা প্রভৃতি নগরী তাঁর আমলে বিখ্যাত হয়। তাঁর সভায় ছিলেন 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের রচয়িতা অশ্বঘোষ, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন, দার্শনিক পণ্ডিত বসুমিত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের রচয়িতা চরক।

অশোক স্তম্ভ

গুপ্তযুগের সংস্কৃতি ও শিল্পকলা—ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুপ্তযুগকে বলা হয় সুবর্ণ যুগ। সে সময় ভারতীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁর বীণা বাজান মূর্তিটি লক্ষ্য করবার মত। গুপ্তযুগের দেবদেবীর হিন্দু মূর্তি ও বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলির শিল্পসৌন্দর্য প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে সাঁচীর বোধিসত্ত্ব, সারনাথের বুদ্ধমূর্তি, দেওগড়ের শিব ও বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখযোগ্য। মথুরার ব্রঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি বিখ্যাত। ভীতরগাঁওয়ে ইটের তৈরি মন্দিরের গায়ে যে সব দেবমূর্তি আছে, সেগুলিও খুব সুন্দর। গুপ্তযুগের শিল্পরীতি কালক্রমে যবদ্বীপ, শ্যাম ও কম্বোজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চিত্রশিল্প প্রসঙ্গে অজন্তা—গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। অজন্তার গুহাচিত্রগুলি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে মোট ৩২টি গুহা আছে। পাহাড় কেটে একের পর এক গুহার সারি। অবশ্য সবগুলিই যে গুপ্তযুগে একসঙ্গে তৈরি হয়—এ কথা বলা যায় না। তবে কতকগুলি যে সে সময়ে তৈরি হয়েছিল, এটা নিশ্চিত। গুহার গায়ে গৌতম বুদ্ধের জীবনী নিয়ে আঁকা ছবিই বেশি। তবে পশুপাখী, গাছপালা—এ সবেরও ছবি আছে। গুহার মধ্যে ছাদের নকশাগুলি বড়ই সুন্দর। অজন্তাগুহার সুন্দর চিত্রকলা দেখলে আজও অবাক হতে হয়।

গুপ্তযুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ—গুপ্তযুগে সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতি হয়। সমুদ্রগুপ্ত নিজে কবি ছিলেন। তিনি নিজেই 'কবিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সভাকবি **হরিষেণ** প্রশস্তি রচনা করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় কত সব জ্ঞানী গুণী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাকবি **কালিদাস** ছিলেন নবরত্নের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর রচিত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার কাব্য ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র এ যুগের আগেই লেখা হয়। সেই সব স্মৃতিশাস্ত্রে সমাজের রীতিনীতি, আইন ও আচার—এ সবের পরিচয় আছে।

অজন্তার চিত্র

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর্যভট্টের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহির 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামে জ্যোতিষ গ্রন্থ লেখেন। গুপ্তযুগের বৈজ্ঞানিকরা সম্ভবত গ্রীস ও রোমের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দিল্লীর কাছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে যে লোহার থামটি তৈরি হয়, তার ধাতুশিল্পে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব আজকের যুগেরও বিস্ময়। আজ পর্যন্ত এটি মলিন হয় নি।

শিক্ষাকেন্দ্র—প্রাচীন ভারতে শিক্ষার জন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধযুগেরও আগে স্থাপিত হয়। ব্যাকরণের দিকপাল স্বয়ং পাণিনি তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন।

কৌটিল্যও এখানে পড়তেন। কাশী, অমরাবতী, মাদুরা—এসব স্থানেও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে পাটলিপুত্রের কাছে বড়গাঁও নামে এক গ্রামাঞ্চলে বুদ্ধের শিষ্যরা বৌদ্ধ বিহার গড়ে তোলেন। কালে নালন্দা-বিহার নামে সেটি হয় এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়। সেখানে দশ হাজার আবাসিক ছাত্র উচ্চ শিক্ষা পেত। প্রায় এক শ' বক্তৃতামঞ্চে আচার্যরা পাঠ দিতেন। ছাত্রদের আহার, বাসস্থান ও লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয় স্থানীয় সব অধিবাসী এবং রাজারা নির্বাহ করতেন। দেশ ও বিদেশের জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা এখানে এসে কত উচ্চশিক্ষা নিয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও এখানে কিছু

অজন্তাগুহার আর একটি ছবি

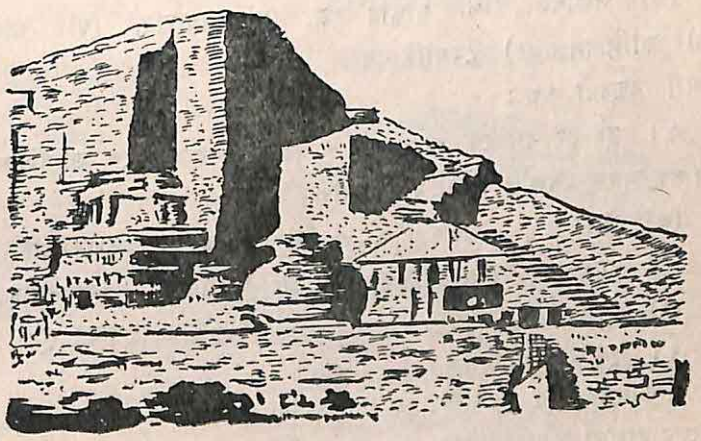

নালন্দাবিহারের ভগ্নাবশেষ

কাল পড়াশুনা করেন। এর অধ্যক্ষদের মধ্যে শীলভদ্র ছিলেন বাঙালী। সাতশ' বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয় একভাবে উচ্চ শিক্ষার আলোক

বিস্তার করেছে। এ আমাদের অতীত দিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কীর্তিকাহিনী। আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করে।

অনুশীলনী

[ক] রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। বিদেশী পর্যটকদের লেখা বিবরণে প্রাচীন ভারতের কথা যা জানা যায়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের কথা বল।

৩। গুপ্তযুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতি সম্বন্ধে কি জান লেখ।

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ফা-হিয়েনের লেখা বিবরণ থেকে তখনকার সমাজের কথা বল।

২। কুষাণযুগের শিল্প ও সংস্কৃতি কেমন ছিল?

৩। অজন্তার চিত্রশিল্প বলতে কি বোঝ?

৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন ছিল?

৫। নিম্নের বিষয়গুলির ওপরে ঐতিহাসিক টীকা লেখ :—

(ক) তক্ষশিলা, (খ) গান্ধার শিল্প, (গ) অশ্বঘোষ, (ঘ) আর্যভট্ট, (ঙ) কালিদাস, (চ) মেগাস্থিনিস।

[গ] বস্তুধর্মী প্রশ্ন :

১। দুই দুই সারিতে প্রত্যেকটি শব্দের বাঁদিকের পাশে ডানদিকে যে সব শব্দ আছে, সেগুলিকে ঠিকমত সাজাও।

(ক) সাঁচী	নাটক	(ঘ) কণিষ্ক	মৌর্যসম্রাট
(খ) রঘুবংশ	বিশ্ববিদ্যালয়	(ঙ) অশোক	কুষাণসম্রাট
(গ) নালন্দা	কাব্য	(চ) অভিজ্ঞান-শকুন্তল	স্তূপ

২। শূন্য স্থান পূরণ কর :

সারনাথের স্তম্ভে — মূর্তি ছিল। মথুরার বুদ্ধমূর্তি — তৈরি। শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের —। বরাহমিহির — লেখেন।

———

॥ সময়-সূচী ॥

ভিন্ন ভিন্ন যুগ অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির সভ্যতা বিকাশ প্রসঙ্গে সময়ের তালিকা নীচে দেওয়া হল। খ্রীঃ পূঃ= খ্রীষ্টপূর্ব অব্দ। খ্রীঃ= খ্রীষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির যথাসম্ভব আরম্ভকাল দেওয়া হল।

আনুমানিক	যুগ ও অঞ্চলের নাম
খ্রীঃ পূঃ ৫০,০০০	আদি মানব যুগ
খ্রীঃ পূঃ ৩০,০০০	প্রাচীন প্রস্তর যুগ
„ ৮,০০০	নতুন প্রস্তর যুগ
„ ৫,০০০	তামা-ও-ব্রঞ্জ যুগ
খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০	প্রাচীন সভ্যতার প্রকাশ
খ্রীঃ পূঃ ৪০০০	(ক) মেসোপটেমিয়া : সুমেরীয় সভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০),
খ্রীঃ পূঃ ৪০০০—খ্রীঃ পূঃ ৩০	(খ) মিশর : প্রধান ফ্যারাও খুফু (খ্রীঃ পূঃ ২৮৯৮), হিক্‌শসদের রাজত্ব শুরু (খ্রীঃ পূঃ ১৭৮৮), তৃতীয় থুথমেস (খ্রীঃ পূঃ ১৪৭১), ইখনাতোন (খ্রীঃ পূঃ ১৩৭৫)। [সাম্রাজ্য প্রসঙ্গ পরে যথাস্থানে দেখ]
খ্রীঃ পূঃ ৩০০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০০	(গ) সিন্ধুসভ্যতা

খ্রীঃ পূঃ ২৬০০-খ্রীঃ পূঃ ২৫০ (ঘ) চীন

চীনা কাহিনীর প্রথম রাজা (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩০), সাঙবংশ শুরু (খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০), চৌবংশ প্রতিষ্ঠা (খ্রীঃ পূঃ ১১২৫), শীনবংশ (খ্রীঃ পূঃ ২৫০)।

[চীন রাজবংশ পরে দেখ]

খ্রীঃ পূঃ ২০০০ **লৌহযুগের সমাজ**

॥ এক ॥

(ক) ব্যাবিলন :

হামুরাবির মেসোপটেমিয়া জয় (খ্রীঃ পূঃ ২১০০), দ্বিতীয় সারগন (খ্রীঃ পূঃ ৭২২), ক্যাল্ডীয় উপজাতির সাম্রাজ্য (খ্রীঃ পূঃ ৬০৬), নেবুকদনেজার (খ্রীঃ পূঃ ৬০৪), পারস্য সম্রাট সাইরাসের ব্যাবিলন দখল (খ্রীঃ পূঃ ৫৩৮)।

(খ) মিশর সাম্রাজ্য :

সাম্রাজ্যবিস্তার শুরু (খ্রীঃ পূঃ ১৬০০), কামবাইসিসের মিশর জয় (খ্রীঃ পূঃ ৫২৫), আলেকজাণ্ডারের মিশর জয় (খ্রীঃ পূঃ ৩৩২)।

(গ) ইরান বা পারস্য :

আর্যজাতির বসতি স্থাপন (খ্রীঃ পূঃ ২০০০), মিডি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (খ্রীঃ পূঃ ৮৫০), পারস্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাইরাস(খ্রীঃপূঃ৫৫০), কামবাইসিসের মিশরঅধিকার(খ্রীঃপূঃ ৫২৫:), পারস্য-সম্রাট দেরিয়াস (খ্রীঃ পূঃ ৫২১)।

(ঘ) ইহুদী ঃ

মিশরে আগমন (খ্রীঃ পূঃ ১৮০০), মিশর ত্যাগ ও কানানে প্রতিষ্ঠা (খ্রীঃ পূঃ ১০০০), সোলোমন (খ্রীঃ পূঃ ৯৬০), বন্দী ইহুদীদের ব্যাবিলনে প্রেরণ (খ্রীঃ পূঃ ৫৮৬)।

॥ দুই ॥

গ্রীস ঃ

হোমারের যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৯০০), ম্যারাথনের যুদ্ধ : পারসিক অভিযানের প্রতিরোধ (খ্রীঃ পূঃ ৪৯০), পেরিক্লিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৬৬), সক্রেটিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৬৭), হিরোডোটস (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪), আলেকজাণ্ডারের মিশর অভিযান (খ্রীঃ পূঃ ৩৩২), ভারত অভিযান (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬), মৃত্যু (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩), রোমের কাছে গ্রীসের পরাজয় (খ্রীঃ পূঃ ২০০)।

॥ তিন ॥

রোম ঃ

রোমের পত্তন (খ্রীঃ পূঃ ৮০০), আধিপত্য বিস্তার, ইটালিতে রোম-কার্থেজ সংঘর্ষ, পিউনিক যুদ্ধ (প্রথম,—খ্রীঃ পূঃ ২৬৪, দ্বিতীয়—খ্রীঃ পূঃ ২১৯, তৃতীয়, খ্রীঃ পূঃ ১৪৯), স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ (খ্রীঃ পূঃ ৭৩), জুলিয়াস সিজার (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৪৪), নিরো (৫৪ খ্রীঃ) কনস্টানটাইন (খ্রীঃ ৩০৬), খ্রীষ্টধর্মের প্রসার, ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে রোম ধ্বংস (খ্রীঃ ৪৫৫)।

॥ চার ॥

চীন রাজবংশ :

সাঙ বংশের প্রতিষ্ঠা (খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০), চৌ রাজবংশ (খ্রীঃ পূঃ ১১২২), কনফিউশিয়াস (খ্রীঃ পূঃ ৫৫০) শীনবংশ (খ্রীঃ পূঃ ২৫০), হানবংশের পতন (খ্রীঃ পূঃ ২২০), ট্যানবংশ (খ্রীঃ পূঃ২২০)।

॥ পাঁচ ॥

খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-৬২০ খ্রীঃ

ভারতবর্ষ :

বৈদিক আর্য সভ্যতার আরম্ভ (খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ১৫০০), মহাবীর (খ্রীঃ পূঃ ৫৪০), বুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৬), আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬), মগধে মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, : চন্দ্রগুপ্ত (খ্রীঃ পূঃ ৩২২), অশোক (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩)। কণিষ্ক (৭৮ খ্রীঃ, অন্যমতে ১৪২ খ্রীঃ), গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (৩১৯-২০ খ্রীঃ), প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রীঃ), সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০ খ্রীঃ), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৬ খ্রীঃ), বাংলায় সম্রাট শশাঙ্ক (৬০৩ খ্রীঃ)।

চিত্র ও মানচিত্রের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জাভা মানুষ	৭
২। আগুনের ব্যবহার	৮
৩। প্রাচীন প্রস্তর যুগের উপকরণ	৯
৪। প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতুড়ি	৯
৫। নতুন প্রস্তর যুগের পাথর	১০
৬। আলতামিরার বাইসনের ছবি	১২
৭। নকশা করা মাটির হাঁড়ি	১২
৮। আদিম সভ্যতার কেন্দ্র (মানচিত্র)	১৯
৯। মেসোপটেমিয়া (মানচিত্র)	২০
১০। কিউনিফর্ম লিপি ও সংখ্যার লিপি	২৩
১১। মিশর (মানচিত্র)	২৬
১২। মিশরের মমি	২৯
১৩। হায়ারোগ্লিফিক লিপি	৩০
১৪। ফ্যারাও চতুর্থ—ইখনাতোন	৩২
১৫। জলহস্তিনী দেবতা	৩৩
১৬। মিশরের পিরামিড	৩৩
১৭। মিশরের পাত্র	৩৪
১৮। সিন্ধু সভ্যতা (মানচিত্র)	৩৫
১৯। মহেন-জো-দরোর স্নানাগার	৩৭
২০। সোনা রূপার অলঙ্কার	৩৮
২১। ব্রঞ্জের মূর্ত্তি	৩৯
২২। পুতুল	৩৯
২৩। সীলমোহর	৪০
২৪। পশুপতি মূর্ত্তি	৪০
২৫। হামুরাবির মূর্ত্তি	৫২
২৬। ঈজিয়ান সভ্যতা (মানচিত্র)	৬৬
২। জিয়াস	৬৯
২৮। এপোলো	৬৯
২৯। এথেনা	৬৯
৩০। পেরিক্লিস	৭৫
৩১। সক্রেটিস	৭৬
৩২। হিরোডোটস	৭৭
৩৩। আলেকজাণ্ডার	৭৮
৩৪। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পথ (মানচিত্র)	৭৯
৩৫। ধাপকাটা এম্ফিথিয়েটার	৮০
৩৬। রোম সাম্রাজ্যের বিস্তার (মানচিত্র)	৮৪
৩৭। রোমের ক্রীতদাস	৮৬
৩৮। জুলিয়াস সিজার	৮৭
৩৯। কলোসিয়াম (ক্রীড়াশালা)	৯০

	বিষয়	পৃষ্ঠা		বিষয়	পৃষ্ঠা
৪০।	চীনদেশীয় সভ্যতা (মানচিত্র)	৯৪	৪৮।	কণিষ্কের ভগ্নমূর্ত্তি	১১১
৪১।	চীনের প্রাচীর	৯৫	৪৯।	সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা	১১২
৪২।	কনফিউশিয়াস	৯৬	৫০।	হূন আক্রমণ	১১৩
৪৩।	মহাবীর জিন	১০৫	৫১।	সাঁচী স্তূপ	১১৮
৪৪।	গৌতম বুদ্ধ	১০৬	৫২।	অশোক স্তম্ভ	১১৯
৪৫।	সম্রাট অশোক	১০৮	৫৩।	অজন্তার চিত্র	১২০
৪৬।	ব্রাহ্মী লিপি	১০৯	৫৪।	অজন্তার আর এক ছবি	১২১
৪৭।	মৌর্য সাম্রাজ্য (মানচিত্র)	১১০	৫৫।	নালান্দা বিহারের ভগ্নাবশেষ	১২২
			৫৯।	সভ্যতার ক্রমবিকাশ (প্রচ্ছদপট)	

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. T. Road